

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

আনন্দপাঠ

(বাংলা দ্রুতপঠন)

অষ্টম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক শ্যামলী আকবর

অধ্যাপক ড. খালেদ হোসাইন

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম

অধ্যাপক ড. হিমেল বরকত

অধ্যাপক ড. মো. মেহেদী হাসান

ড. মো. জফির উদ্দিন

ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

ড. প্রকাশ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২০

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপরোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনোক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশথেম, মূল্যবোধ ও নেতৃত্বকারী শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি সংস্কৃতিভিত্তিক শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পদ পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসম্পদতা ও কৌতৃহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

অষ্টম শ্রেণির আনন্দপাঠ বইটি শিক্ষার্থীদের জন্যে দ্রুতপঠনের পাঠ্যপুস্তক। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ও তাদের মননত্বঙ্গ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বইখানি প্রয়োজন করা হয়েছে। বইটিতে বাংলা ভাষার লেখক ছাড়াও বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখার অনুবাদ সংকলন করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্পর্কে তুলনামূলক ধারণা পাবে। বইটিতে সংকলিত রচনাগুলো বিষয়ের দিক থেকে একইসঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রসঘন। আশা করা যায়, পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদের মনে আনন্দ ঘোগাবে এবং চিন্মের বিকাশ ঘটাবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লাসিক অনুবঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দশীল হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখিতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিচ্ছিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সর্তকতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলগুলি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মাণোন্ময়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কাকতাড়ুয়া	সত্যজিৎ রায়	১-৭
নয়া পন্তন	জহির রায়হান	৮-১৪
হেমাপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি	হাসান আজিজুল হক	১৫-২২
ডেভিড কপারফিল্ড	চার্লস ডিকেপ বৃগান্তর : আধ্যাতর্কজ্ঞান ইলিয়াস	২৩-৩১
মুক্তি	অ্যালেক্স হ্যালি অনুবাদ : গীতি সেন	৩২-৩৮
ফিলিস্তিনের চিঠি	ঘাসান কানাফানি অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৯-৪৮
তিরন্দাজ	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	৪৫-৫০
নাটক মানসিংহ ও ইসা খা	ইত্বাইম খা	৫১-৫৫
ভ্রমণ-কাহিনি কাবুলের শেষ প্রহরে	সৈয়দ মুজতবা আলী	৫৬-৬০

কাকতাড়া

সত্যজিৎ রায়



মৃগাঙ্কবাবুর সন্দেহটা যে অমূলক নয় সেটা প্রমাণ হলো পানাগড়ের কাছাকাছি এসে। গাড়ির পেট্টোল ফুরিয়ে গেল। পেট্টোলের ইনডিকেটরটা কিছুকাল থেকেই গোলমাল করছে, সে কথা আজও বেরোবার মুখে জ্বাইভার সুধীরকে বলেছেন, কিন্তু সুধীর গা করেনি। আসলে কাঁটা যা বলছিল তার চেয়ে কম পেট্টোল ছিল ট্যাংকে।
‘এখন কী হবে?’ জিজ্ঞেস করলেন মৃগাঙ্কবাবু।

‘আমি পানাগড় চলে যাচ্ছি’, বলল সুধীর, ‘সেখান থেকে তেল নিয়ে আসব।’

‘পানাগড় এখান থেকে কতদূর?’

‘মাইল তিনেক হবে।’

‘তার মানে তো দু-আড়াই ঘণ্টা। শুধু তোমার দোষেই এটা হলো। এখন আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ?’
মৃগাঙ্কবাবু ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ, কিন্তু আড়াই ঘণ্টা খোলা মাঠের মধ্যে একা গাড়িতে বসে থাকতে হবে জেনে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল।

‘তাহলে আর দেরি করো না, বেরিয়ে পড়ো। আটটার মধ্যে কলকাতা ফিরতে পারবে তো? এখন সাড়ে তিনটে।’
‘তা পারব বাবু।’

‘এই নাও টাকা। আর ভবিষ্যতে এমন ভুলটি কোরো না কখনো। লংজার্নিতে এসব রিক্ষের মধ্যে যাওয়া কখনোই উচিত নয়।’

সুধীর টাকা নিয়ে চলে গেল পানাগড় অভিমুখে।

মৃগাক্ষেপের মুখোপাধ্যায় খ্যাতনামা জনপ্রিয় সাহিত্যিক। দুর্গাপুরে একটি ঝাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হয়েছিল মানপত্র দেওয়া হবে বলে। ট্রনে রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি, তাই মোটরে যাত্রা। সকালে চা খেয়ে বেরিয়েছেন, আর ফেরার পথে এই দুর্ঘটণ। মৃগাক্ষবাবু কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না, পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করাটা তাঁর মতে কুসংস্কার, কিন্তু আজ পাঁজিতে যাত্রা বিষিঞ্চ বললে তিনি অবাক হবেন না। আপাতত গাড়ি থেকে নেমে আড় ভেঙে তিনি তাঁর চারদিকটা ঘুরে দেখে নিলেন।

মাঘ মাস, খেত থেকে ধান কাটা হয়ে গেছে, চারদিক ধু-ধু করছে মাঠ, দূরে, বেশ দূরে, একটিমাত্র কুঁড়ের একটি তেঁতুলগাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া বসতির কোনো চিহ্ন নেই। আরও দূরে রয়েছে একসারি তালগাছ, আর সবকিছুর পিছনে জমাটবাঁধা বন। এই হলো রাস্তার এক দিক, অর্থাৎ পুব দিকের দৃশ্য।

পশ্চিমেও বিশেষ পার্থক্য নেই। রাস্তা থেকে চলিশ-পঞ্চাশ হাত দূরে একটা পুরুর রয়েছে। তাতে জল বিশেষ নেই। গাছপালা যা আছে তা—দু একটা বাবলা ছাড়া—সবই দূরে। এদিকেও দুটি কুঁড়ের রয়েছে; কিন্তু মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। আকাশে উত্তরে মেঘ দেখা গেলেও এদিকে রোদ। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাকতাড়ুয়া।

শীতকাল হলোও রোদের তেজ আছে বেশ, তাই মৃগাক্ষবাবু গাড়িতে ফিরে এলেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা গোঘেন্দাকাহিনি বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন।

এর মধ্যে দুটো অ্যাদ্বাসাড়ির আর একটা লরি গেছে তাঁর পাশ দিয়ে, তার মধ্যে একটা কলকাতার দিকে। কিন্তু কেউ তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করার জন্য থামেনি। মৃগাক্ষবাবু মনে মনে বললেন, বাঙালিরা এ-ব্যাপারে বড়ো স্বার্থপর হয়। নিজের অসুবিধা করে পরের উপকার করাটা তাদের কুঠিতে লেখে না। তিনি নিজেও কি এদের মতোই ব্যবহার করতেন? হয়তো তাই। তিনিও তো বাঙালি। শেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাঁর মজাগত দোষগুলোর কোনো সংক্ষার হয়নি।

উত্তরের মেঘটা অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত এগিয়ে এসে সূর্যটাকে ঢেকে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া। মৃগাক্ষবাবু ব্যাগ থেকে পুলওভারটা বার করে পরে নিলেন। এদিকে সূর্যও দ্রুত নিচের দিকে নেমে এসেছে। পাঁচটার মধ্যেই অন্ত যাবে। তখন ঠাণ্ডা বাড়বে। কী মুশকিলে ফেলল তাঁকে সুধীর!

মৃগাক্ষবাবু দেখলেন যে, বইয়ে মন দিতে পারছেন না। তার চেয়ে নতুন গল্পের প্লট ভাবলে কেমন হয়? ‘ভারত’ পত্রিকা তাঁর কাছে একটা গল্প চেয়েছে, সেটা এখনও লেখা হয়নি। একটা প্লটের খানিকটা মাথায় এসেছে এই পথটুকু আসতেই। মৃগাক্ষবাবু নোটবুক বার করে করেকটা পয়েন্ট লিখে ফেললেন।

নাহ, গাড়িতে বসে আর ভালো লাগে না।

খাতা বৰ্ষ করে আবাৰ বাইরে এসে দাঁড়ালেন মৃগাঙ্কবাৰু। তাৱণিৰ কয়েক পা সামনে এগিয়ে গ্ৰামৰ মাঝখানে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখে তাঁৰ মনে হলো বিশ্চৰাচৰে তিনি একা। এমন একা তিনি কোনোদিন অনুভব কৰেলনি।

না, ঠিক একা নয়। একটা নকল মানুষ আছে কিছু দূৰে দাঁড়িয়ে।

ওই কাকতাড়ুয়াটা।

মাঠেৰ মধ্যে এক জায়গায় কী যেন একটা শীতেৰ ফসল রয়েছে একটা খেতে, তাৱই মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কাকতাড়ুয়াটা। একটা খাড়া বাঁশ মাটিতে পৌতা, তাৱ সঙ্গে আড়াআড়িভাৰে একটা বাঁশ ছড়ানো হাতেৰ মতো দুদিকে বেৰিয়ে আছে। এই হাত দুটো গলানো রয়েছে একটা ছেঁড়া জামাৰ দুটো আন্তিনেৰ মধ্য দিয়ে। খাড়া বাঁশটাৰ মাথায় বৰয়েছে একটা উপুড় কৰা মাটিৰ হাঁড়ি। দূৰ থেকে বোৰা যায় না, কিন্তু মৃগাঙ্কবাৰু অনুমান কৱলেন সেই হাঁড়িৰ রং কালো, আৱ তাৱ ওপৰ সাদা রং দিয়ে আঁকা রয়েছে ড্যাবা ড্যাবা চোখ-মুখ। আশৰ্য— এই জিনিসটা পাখিৱা আসল মানুষ ভেবে ভুল কৰে, আৱ তাৱ ভয়ে খেতে এসে উৎপাত কৰে না। পাখিদেৱ বুদ্ধি কি এতই কম? কুকুৰ তো এ ভুল কৰে না। তাৱা মানুষেৰ গৰু পায়। কাক চড়ুই কি তাৰলে সে গৰু পায় না?

মেঘেৰ মধ্যে একটা ফাটল দিয়ে রোদ এসে পড়ল কাকতাড়ুয়াটাৰ গায়ে। মৃগাঙ্কবাৰু লক্ষ কৱলেন যে, যে জামাটা কাকতাড়ুয়াটাৰ গায়ে পৱানো হয়েছে সেটা একটা ছিটেৰ শার্ট। কাৱ কথা মনে পড়ল ওই ছেঁড়া লাল-কালো ছিটেৰ শার্টটা দেখে? মৃগাঙ্কবাৰু অনেক চেষ্টা কৰেও মনে কৱতে পাৱলেন না। তবে কোনো একজনকে তিনি ওৱৰকম একটা শার্ট পড়তে দেখেছেন—বেশ কিছুকাল আগে।

আশৰ্য—ওই একটি নকল প্ৰাণী ছাড়া আৱ কোনো প্ৰাণী নেই। মৃগাঙ্কবাৰু আৱ ওই কাকতাড়ুয়া। এই সময়টা খেতে কাজ হয় না বলে গ্ৰামেৰ মাঠেঘাটে লোকজন কম দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু এৱৰকম নিৰ্জনতা মৃগাঙ্কবাৰুৰ অভিজ্ঞতায় এই প্ৰথম।

মৃগাঙ্কবাৰু ঘড়ি দেখলেন। চাৱটা কুড়ি। সঙ্গে ঝাঙ্কে চা রয়েছে। সেটাৰ সদ্ব্যবহাৰ কৰা যেতে পাৱে।

গাড়িতে ফিৰে এসে ঝাঙ্ক ঝুলে চাকলায় চা ঢেলে খেলেন মৃগাঙ্কবাৰু। শৰীৰটা একটু গৱম হলো।

কালো মেঘেৰ মধ্যে ফাঁক দিয়ে সূৰ্যটাকে একবাৰ দেখা গেল। কাকতাড়ুয়াটাৰ গায়ে পড়েছে লালচে রোদ। সূৰ্য দূৰেৰ তালগাছটাৰ মাথাৰ কাছে এসেছে, আৱ মিনিট পাঁচকেই অন্ত যাবে।

আৱেকটা অ্যাবাসাদৰ মৃগাঙ্কবাৰুৰ গাড়িৰ পাশ দিয়ে বেৰিয়ে গেল। মৃগাঙ্কবাৰু আৱেকটু চা ঢেলে খেয়ে আবাৰ গাড়ি থেকে নামলেন। সুধীৱেৰ আসতে এখনও ঘটাখানেক দেৰি। কী কৰা যায়?

পশ্চিমেৰ আকাশ এখন লাল। সেদিক থেকে মেঘ সৱে এসেছে। চ্যাপটা লাল সূৰ্যটা দেখতে দেখতে দিগন্তেৰ আড়ালে চলে গেল। এবাৱ ঝাপ কৰে অক্ষকাৰ নামবে।

কাকতাড়ুয়া।

কেন জানি মৃগাঙ্কবাবু অনুভব করছেন প্রতি মুহূর্তেই ওই নকল মানুষটা তাঁকে বেশি করে আকর্ষণ করছে।

সেটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে মৃগাঙ্কবাবু কতকগুলো জিনিস লক্ষ করে একটা হৃদকম্প অনুভব করলেন।

ওটার চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কি?

হাত দুটো কি নিচের দিকে নেমে এসেছে খানিকটা?

দাঁড়ানোর ভঙিটা কি আরেকটু জ্যান্ত মানুষের মতো?

খাড়া বাঁশটার পাশে কি আরেকটা বাঁশ দেখা যাচ্ছে?

ও দুটো কি বাঁশ, না ঠ্যাং?

মাথার হাঁড়িটা একটু ছোটো মনে হচ্ছে না?

তিনি কি এই তেপাঞ্চরের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চোখে ভুল দেখছেন?

কাকতাড়ুয়া কখনো জ্যান্ত হয়ে ওঠে?

কখনোই না।

কিন্তু—

মৃগাঙ্কবাবুর দৃষ্টি আবার কাকতাড়ুয়াটার দিকে গেল।

কোনও সন্দেহ নেই। সেটা জায়গা বদল করেছে।

সেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে।

এসেছে না, আসছে।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা, কিন্তু দু গায়ে চলা। ইঁড়ির বদলে একটা মানুষের মাথা। গায়ে এখনো সেই ছিটের শার্ট; আর তার সঙ্গে মালকেঁচা দিয়ে পরা খাটো ময়লা ধূতি।

‘বাবু!'

মৃগাঙ্কবাবুর সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা শিহরন খেলে গেল। কাকতাড়ুয়া মানুষের গলায় ডেকে উঠেছে এবং এ গলা তাঁর চেনা।

এ হলো তাঁদের এককালের গৃহকর্মী অভিযামের গলা। এদিকেই তো ছিল অভিযামের দেশ। একবার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। অভিযাম বলেছিল, সে থাকে মানকড়ের পাশের গাঁয়ে। পানাগড়ের আগের স্টেশনই তো মানকড়।

মৃগাঙ্কবাবু চৱম ভয়ে পিছোতে পিছোতে গাড়ির সঙ্গে সেঁটে দাঁড়ালেন। অভিযাম এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে। এখন সে মাত্র দশ গজ দূরে।

‘আমায় চিনতে পারছেন বাবু?’

মনে যতটা সাহস আছে সবটুকু একত্র করে মৃগাক্ষবাবু প্রশংস্তা করলেন।

‘তুমি অভিরাম না?’

‘অ্যাদিন পরেও আপনি চিনেছেন বাবু?’

মানুষেরই মতো দেখাচ্ছে অভিরামকে, তাই বোধহয় মৃগাক্ষবাবু সাহস পেলেন। বললেন, ‘তোমাকে চিনেছি তোমার জামা দেখে। এ জামা তো আমিই তোমাকে কিনে দিয়েছিলাম।’

‘হ্যাঁ বাবু, আপনিই দিয়েছিলেন। আপনি আমার জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু শেষে এমন হলো কেন বাবু? আমি তো কোনো দোষ করিনি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কেন?’

মৃগাক্ষবাবুর মনে পড়ল। তিনি বছর আগের ঘটনা। অভিরাম ছিল মৃগাক্ষবাবুদের বিশ বছরের পোরনো গৃহকর্মী। শেষে একদিন অভিরামের ভীমরতি ধরে। সে মৃগাক্ষবাবুর বিয়েতে পাওয়া সোনার ঘড়িটা চুরি করে বসে। সুযোগ-সুবিধা দুই-ই ছিল অভিরামের। অভিরাম নিজে অবশ্য অঙ্গীকার করে। কিন্তু মৃগাক্ষবাবুর বাবা ও বো ডাকিয়ে কুলোতে চাল ছুড়ে মেরে প্রমাণ করিয়ে দেন যে, অভিরামই চোর। ফলে অভিরামকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অভিরাম বলল, ‘আপনাদের ওখান থেকে চলে আসার পর আমার কী হলো জানেন? আর আমি চাকরি করিনি কোথাও, কারণ আমার কঠিন ব্যারাম হয়। উদ্বুরি। টাকা-পয়সা নাই। না ওষুধ, না পদ্ধি। সেই ব্যারামই আমার শেষ ব্যারাম। আমার এই জামাটা ছেলে রেখে দেয়। সে নিজে কিছুদিন পরে। তারপর সেটা ছিঁড়ে যায়। তখন সেটা কাকতাড়ুয়ার পোশাক হয়। আমি হয়ে যাই সেই কাকতাড়ুয়া। কেন জানেন? আমি জানতাম একদিন না একদিন আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। আমার প্রাণটা ছটফট করছিল। —হ্যাঁ, মৃত লোকেরও প্রাণ থাকে—আমি মরে গিয়ে যা জেনেছি সেটা আপনাকে বলতে চাইছিলাম।’

‘সেটা কী অভিরাম?’

‘বাড়ি ফিরে গিয়ে আপনার আলমারির নিচে পিছন দিকটায় খোঁজ করবেন। সেখানেই আপনার ঘড়িটা পড়ে আছে এই তিনি বছর ধরে। আপনার নতুন চাকর ভালো করে ঝাড়ু দেয় না, তাই সে দেখতে পায়নি। এই ঘড়ি পেলে পরে আপনি জানবেন অভিরাম কোনো দোষ করিনি।’

অভিরামকে আর ভালো করে দেখা যায় না—সন্দ্বয় নেমে এসেছে। মৃগাক্ষবাবু শুনলেন অভিরাম বলছে, ‘এতকাল পরে নিশ্চিন্ত হলাম বাবু। আমি আসি। আমি আসি...’

মৃগাক্ষবাবুর চোখের সামনে থেকে অভিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।

‘তেল এনেছি বাবু।’

সুধীরের গলায় মৃগাক্ষবাবুর ঘুমটা ভেঙে গেল। গল্লের পুট ফাঁদতে ফাঁদতে কলম হাতে গাঢ়ির মধ্যে স্থুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঘুম ভাঙতেই তাঁর দৃষ্টি চলে গেল পশ্চিমের মাঠের দিকে। কাকতাড়ুয়াটা যেমন ছিল তেমনভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়িতে এসে আলমারির তলায় খুঁজতেই ঘড়িটা বেরিয়ে পড়ল। মৃগাক্ষবাবু ত্রির করলেন ভবিষ্যতে আর কিছু গেলেও ওবার সাহায্য আর কখনো নেবেন না।

লেখক-পরিচিতি

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর পূর্ব-প্রজন্মের ভিটা ছিল কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলার মসুরা গ্রামে। সত্যজিৎ রায় একজন চলচ্চিত্র-নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্পনির্দেশক, সংগীত পরিচালক ও লেখক। তিনি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের একজন হিসেবে বিবেচিত। তাঁর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র ‘পথের পাঁচালী’ (১৯৫৫) বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করে। চলচ্চিত্র নির্মাণের বাইরে তিনি ছিলেন একাধারে কল্পকাহিনী লেখক, প্রকাশক ও চিত্রকর। তিনি ছোটোগল্প ও উপন্যাসও রচনা করেছেন। তাঁর সৃষ্টি জনপ্রিয় চরিত্র গোয়েন্দা ফেলুদা ও থোফেসর শঙ্কু। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

‘কাকতাড়ুয়া’ গল্পে সত্যজিৎ রায় কুসংস্কারের অভিকর দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে মানবমনে বিচ্ছিন্ন অনুভূতির প্রকাশ ঘটতে পারে। গল্পে একটি অনুষ্ঠান শেষে ব্যক্তিগত গাড়িতে করে কলকাতা ফিরছিলেন লেখক মৃগাঙ্কবাবু। পথে গাড়ির পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার তেল আনতে যান। এই অবকাশে মৃগাঙ্কবাবুর চোখে পড়ল ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি কাকতাড়ুয়া। তিনি লক্ষ করলেন কাকতাড়ুয়ার গায়ে পরানো আছে তিনি বছর আগে তাড়িয়ে দেওয়া তাঁর গৃহকর্মী অভিরামের লাল-কালো ছিটের শার্ট। ওবার কথায় মৃগাঙ্কবাবুর বাবা ঘর্ষের ঘড়ি চুরির অভিযোগে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অভিরাম নিজের বাড়িতে এসে অর্থ-কষ্টে ও রোগে মারা যায়। সেই অভিরাম কাকতাড়ুয়ারুপে লেখককে জানায় যে, আলমারির নিচে পিছন দিকটায় ঘড়িটি এখনো পড়ে আছে। আসলে ঘুমের ঘোরে স্থপ্ত দেখছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বাড়ি ফিরে তিনি আলমারির তলা থেকে ঘড়িটা খুঁজেও পেলেন। অভিরামের মাধ্যমে মৃগাঙ্কবাবুর প্রাপ্ত তথ্য সত্যিকার অর্থে অবচেতনে শুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও এই প্রকাশ। তিনি বুঝতে পারলেন ওবার কথা ঠিক ছিল না। তাই মৃগাঙ্কবাবু সিদ্ধান্ত নেন ভবিষ্যতে কোনো ওবার সাহায্য নেবেন না।

কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস কথনো ভালো ফল বয়ে আনতে পারে না, এ সত্যটিই এ গল্পে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা

অমূলক	- ভিত্তিহীন।
ইনডিকেটর	- নির্দেশক। ইংরেজি Indicator.
ট্যাঙ্কে	- গাড়ির তেল রাখার জায়গা।
লংজার্নি	- দীর্ঘ অবস্থা। ইংরেজি Long journey.
রিস্ক	- ঝুঁকি। ইংরেজি Risk.
মানপত্র	- সম্মানসূচক স্মারক।
রিজার্ভেশন	- সংরক্ষণ। ইংরেজি Reservation.
কুসংস্কার	- বিভিন্ন বিশ্বাস যার পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ থাকে না।
পাঁজি	- পঞ্জিকা; যেখানে তারিখ, সন, তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি লেখা থাকে।
কুঁড়ে ঘর	- খড়কুটো দিয়ে বানানো ছোটো ঘর।

বসতি	— বসবাসের জায়গা ।
অ্যাসামির	— এক ধরনের মোটর গাড়ির নাম । ইংরেজি Ambassador
কুষ্টি	— নবজাতকের ভবিষ্যদ্বাণী শেখা হয় যেখানে ।
মজ্জাগত	— জন্মগত ।
পুলোভার	— সুতোয় বোনা শীতকালীন জামা ।
প্রট	— কাহিনি ।
নোটবুক	— দরকারি তথ্য টুকে রাখার খাতাবিশেষ । ইংরেজি Note Book.
পয়েন্ট	— বিষয়, প্রসঙ্গ । ইংরেজি point.
বিশ্চরাচৰ	— সারা পৃথিবী ।
ড্যাবা ড্যাবা	— বড়ো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।
সম্ব্যবহার	— ঠিকভাবে কোনো কিছু ব্যবহার বা কাজে লাগানো ।
হৎকচ্চি	— হৃদয়ের কচ্চন ।
মালকোঁচা	— দুই পায়ের মধ্য দিয়ে গৌজা ধূতি লুঙ্গি প্রভৃতির কোঁচা ।
শিহৱন	— অনুভূতি ।
সেঁটে	— লেগে থাকা ।
ভীমরতি	— বয়স বাঢ়ার কারণে জ্বানবুদ্ধি লোপ পাওয়া বুঝাতে ব্যবহৃত হয় ।
ব্যারাম	— রোগ ।
উদুরি	— পেটের পীড়া ।

ନୟା ପଡ଼ନ

ଜହିର ରାୟହାନ



ଭୋରେ ଟ୍ରେନେ ଗୌରେ ଫିରେ ଏବେଳେ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ ।

ନୂଜ ଦେହ, କୃଷ୍ଣ ଚଳ, ମୁଖମୟ ବାର୍ଧକ୍ୟେର ଜ୍ୟାମିତିକ ରେଖା ।

ଅନେକ ଆଶା-ଭରସା ନିଯୋଇ ଶହରେ ଗିଯେଛିଲେନ ତିନି । ଭେବେଛିଲେନ, କିଛୁ ଟାକାପଥସା ସାହାଯ୍ୟ ପେଲେ ଆବାର ନତୁନ କରେ ଦାଢ଼ କରାବେଳ କୁଳଟାକେ । ଆବାର ଶୁରୁ କରାବେଳ ଗୌରେର ଛେଳେମେହେଦେର ପଡ଼ାନେର କାଜ । କତ ଆଶା ! ଆଶାର ମୁଖେ ଛାଇ !

କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଲ ନା କୁଳଟାର ଜନ୍ୟ । ନା ଚୌଧୁରୀରା । ନା ସରକାର । ସରକାରେର କାହେ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଇତେ ଗିଯ଼େ ତୋ ଗୀତିମତୋ ଧରକିଇ ଖେଳେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗେର ବଡ଼ୋ ସାହେବ ଶମ୍ବେର ଥାନ ବଲାଲେନ, ରାଜଧାନୀତେ ଦୁଟୋ ନତୁନ ହୋଟେଲ ତୁଳେ, ଆର ସାହେବଦେର ଛେଳେମେହେଦେର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଇଂଲିଶ କୁଳ ଦିତେ ଗିଯେ ପ୍ରାୟ କୁଡ଼ି ଲାଖ ଟାକାର ମତୋ ଖରଚ । ଫାନ୍ଦେ ଏଥିନ ଆଖଲା ପରସା ନେଇ ସାହେବ । ଅଯଥା ବାରବାର ଏମେ ଜ୍ଵାଳାତମ କରାବେଳ ନା ଆମାଦେର । ପକେଟେ ସଦି ଟାକା ନା ଥାକେ, କୁଳ ବର୍କ କରେ ଚୁପଚାପ ବସେ ଥାକୁନ । ଏମନଭାବେ ଧରିବେ ଉଠେଛିଲେନ ତିନି ଯେବେ କୁଳେର ଜନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଚାଇତେ ଏମେ ଭାବି ଅନ୍ୟାଯ କରେ ଫେଲେଛେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ ।

ହେଠେ ମାଥାଯ ସେଖାନ ଥେକେ ବେରିଯେ ଚଲେ ଏଲେଓ, ଏକେବାରେ ଆଶା ହାରାନି ତିନି । ଭେବେଛିଲେନ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଲ ନା, ଚୌଧୁରୀ ସାହେବ ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବେନ । ଏକକାଳେ ତୋ ଚୌଧୁରୀ ସାହେବେର ସହ୍ୟୋଗିତା ପେଇସି ନା ଝୁଲୁଟା ଦିଯେଛିଲେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ ।

ମେ ଆଜ ବହର ପଞ୍ଚଶିକ ଆଗେର କଥା—

ଆଶେଗାଶେ ଦୁ-ଚାର ଗୀଯେ କୁଳ ବଲତେ କିଛୁଇ ଛିଲ ନା ।

ଲେଖାପଡ଼ା କାକେ ବଲେ ତା ଜାନତଇ ନା ଗୀଯେର ଲୋକ ।

ତଥନ ସାବମାତ୍ର ଏନ୍ଟ୍ରାଙ୍ ପାଶ କରେ ବେରିଯେଛେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ । ବାଇଶ ବହରେ ଜୋଯାନ ଛେଲେ ।

ଚୌଧୁରୀ ତଥନ ଘୋବନକାଳ । ଗୀଯେଇ ଥାକତେନ ତିନି । ଗୀଯେ ଥେକେ ଜମିଦାରିର ତଦାରକ କରତେନ । ଅବସର ସମୟ ତାସ, ପାଶା ଆର ଦାବା ଖେଳତେନ ବସେ ବସେ । କଥାଯ କଥାଯ ଗୀଯେ ଏକଟି କୁଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇଚ୍ଛଟା ତାଁର କାହେ ବାକ୍ କରେଛିଲେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ । ଜୁଲୁ ଚୌଧୁରୀ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଲେନ । ବଲଲେନ, ମେ ତା ବଡ଼ୋ ଭାଲ କଥା, ଗୀଯେର ଲୋକଙ୍ଗଲୋ ସବ ଗଞ୍ଜର୍ଥ ରଯେ ଯାଚେ । ଏକଟା କୁଳେ ଯଦି ଓଦେର ଲେଖାପଡ଼ା ଶେଖାତେ ପାରୋ ମେ ତୋ ବଡ଼ୋ ଭାଲୋ କଥା । କାଜ ଓରକ କରେ ଦାଓ ।

ଟାକାପଯାସା ଖୁବ ବେଶି ନା ଦିଲେଓ, କୁଲେର ଜନ୍ୟ ଏକଟା ଅନାବାଦି ଜମି ହେଡେ ଦିଯେଛିଲେନ ଜୁଲୁ ଚୌଧୁରୀ । ଶହର ଥେକେ ଛୁଟୋର ମିଞ୍ଚି ନିଯେ ଏଲେ ଗୁଟିକରେକ ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ ଟୁଳ ଆର ଟେବିଲ୍ ତୈରି କରେ ଦିଯେଛିଲେନ ତିନି ।

ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଲ ଦୁ-ଟୁକରୋ ଖେଳେ ଜମି ଛିଲ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତରେ । ମେ ଦୁଟୋ ବିକ୍ରି କରେ, କୁଲେର ଜନ୍ୟ ଟିନ, କାଠ ଆର ବେଡ଼ା ତୈରିର ବାଶ କିନ୍ବେଛିଲେନ ତିନି ।

ବ୍ୟରେ ପରିମାଣଟା ତାଁରଇ ବେଶି ଛିଲ, ତବୁ ଚୌଧୁରୀର ନାମେଇ କୁଳଟାର ନାମକରଣ କରେଛିଲେନ ତିନି—ଜୁଲୁ ଚୌଧୁରୀର କୁଳ । ଆଟହାତ କାଠେର ମାଥାଯ ପେରେକ ଆଁଟା ଚାରକୋଣି ଫଳକେର ଓପର ଜୁଲୁ ଚୌଧୁରୀର ନାମଟା ଭୁଲଭୁଲ କରତ ସକାଳ, ବିକେଳ ।

ଆଜୋ କରେ ।

ଯଦିଓ ଆକଞ୍ଚିକ ବାଡ଼େ ମାଟିତେ ମୁଖ ଥୁବଡ଼େ ଭେତେ ପଡ଼େହେ କୁଳଟା । ଆର ତାର ଟିନଙ୍ଗଲୋ ଜଂ ଧରେ ଅକେଜୋ ହୟେ ଗେହେ ବସେର ବାର୍ଧକ୍ୟହେତୁ ।

କୁଳଟା ଭେତେ ପଡ଼େହେ । ମେଟା ଆବାର ନତୁନ କରେ ତୁଳତେ ହଙ୍ଗେ ଅନେକ ଟାକାର ଦରକାର । ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ ଭେବେଛିଲେନ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଲ ନା, ଜୁଲୁ ଚୌଧୁରୀ ନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବେନ । କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗିଲ ।

ସାହାୟେର ନାମେ ରୀତିମତୋ ଆଁତକେ ଉଠେଲେନ ଜୁଲୁ ଚୌଧୁରୀ । ବଲଲେନ, ପାଗଲ, ଟାକାପଯାସାର କଥା ମୁଖେ ଏଲୋ ନା କଥନୋ । ଦେଖଇ ନା କତ ବଡ଼ୋ ସ୍ଟାର୍ଟିଶମେନ୍ଟ । ଚାଲାତେ ଗିଯେ ରେଣ୍ଟାର ହାସଫାଁସ ହୟେ ଯାଚିଛ । ଆଧିଳା ପର୍ଯ୍ୟାନ ନେଇ ହାତେ । ଏଦିକ ଦିଯେ ଆସଛେ, ଓଦିକ ଦିଯେ ଯାଚେ ।

ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ ବୁଝିଲେନ, ଗୀଯେର ଛେଲେଙ୍ଗଲୋ ଲେଖାପଡ଼ା ଶିଖୁକ, ତା ଆର ଚାନ ନା ଚୌଧୁରୀ ସାହେବ ।

କେଉଁଇ ଚାନ ନା ।

ନା ଚୌଧୁରୀ, ନା ସରକାର, କେଉଁ ନା ।

ଅଗତ୍ୟା ଗୀଯେ ଫିରେ ଏଲେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ ।

তেওঁে পড়া স্কুলটার পাশ দিয়ে আসবার সময় দু-চোখে পানি উপচে পড়ছিল শনু পণ্ডিতের। লুঙ্গির খুঁটে চোখের পানিটা মুছে নিলেন। গ্রামের লোকগুলো উনুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল তাঁর অপেক্ষায়। ফিরে আসতেই জিজেস কুরল, কী পণ্ডিত, টাকা-পয়সা কিছু দিল চৌধুরী সাহেবে?

না, গভীর গলায় উত্তর দিলেন শনু পণ্ডিত। চৌধুরীর আশা ছাইড়া দাও মিয়ারা। এক পয়সাও আর পাইবা না তার কাছ থাইকা। সেই আশা ছাইড়া দাও।

পণ্ডিতের কথা শুনে কেমন স্নান হয়ে গেল উপন্থিত লোকগুলো। বুড়ো হাশমত বলল, আমাগো ছেইলাপেইলাগুলা বুঝি মূর্খ থাইকবো?

তা, আর কী কইবার আছে কও। আমি তো আমার সাধ্যমতো করছি? আন্তে বলল শনু পণ্ডিত!

বুড়ো হাশমত বলল, তুমি আর কী কইবার পণ্ডিত। তুমি তো এমনেও বছত কইবার। বিয়া কর নাই, শাদি কর নাই। সারা জীবনটাই তো কাটাইছ ওই সুলের পিছনে। তুমি আর কী কইবার।

দুপুরে তত রোদে তখন ঝাঁ ঝাঁ করছিল মাঠ ঘাট, প্রাঞ্চর। দূরে খাসড়ের মাঠে গুরু চরাতে গিয়ে বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিল কোনো রাখাল ছেলে। বাতাসে বেগ ছিল না। আকাশটা মেঘশূন্য।

সবাইকে চুপচাপ দেখে আমিন বেগারি বলল, আর রাইখা দাও লেখাপড়া। আমাগো বাগ-দাদা চৌদ্দপুরুষে কোনো দিন লেখাপড়া করে নাই। খেতের কাজ কইবা খাইছে। আমাগো ছেইলাপেইলারাও তাই কইবো। লেখাপড়ার দরকার নাই।

তা মন্দ কও নাই বেগারি। তাকে সমর্থন জানাল মুলি আকরম হাজি। লেখাপড়ার কোনো দরকার নাই। আমাগো বাগ-দাদায় জাইনতোও না দেইখা বুঝি আমাগো ছেইলাপেইলাগুলাও কিছু জাইনবো না। ইতা কিতা কও মিয়া।

বাগ-দাদায় জাইনতোও না দেইখা বুঝি আমাগো ছেইলাপেইলাগুলাও কিছু জাইনবো না। ইতা কিতা কও মিয়া। তকু শেখ কুখ্যে উঠল ওদের ওপর।

শনু পণ্ডিত বলল, আগের জমানা চইলা গেছে মিয়া। এই জমানা অইছে লেখাপড়ার জমানা। লেখাপড়া না জাইনলে এই জমানায় মানুষের কদর অয় না।

তা তোমরা কি কেবল কথা কইবা, না কিছু কইবার। জোয়ান ছেলে তোরাব আলী অধৈর্য হয়ে পড়ল। বলল, চৌধুরীরা তো কিছু দিব না, তা বুঝাই গেল। আর গরমেন্টো—গরমেন্টোর কথা রাইখা দাও। গরমেন্টোও মহিরা গেছে। এহন কী কইবারা, একডা কিছু করো।

হঁ। কী কইবারা করো। চিঞ্চা করো মিয়ারা। বিড়বিড় করে বলল শনু পণ্ডিত। বুড়ো হাশমত চুপচাপ কী যেন ভাবছিল এতক্ষণ। ছেলে দুটো আর বাচ্চা নাতিটাকে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে সুলে দিয়েছিল সে। আশা ছিল আর কিছু না হোক লেখাপড়া শিখে অন্তত কাচারির পিয়ান হতে পারবে ওরা। গভীরভাবে হয়তো তাদের কথাই ভাবছিল সে। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বলল, যতসব ইয়ে অইছে—যাও ইস্কুল আমরাই দিমু। কারো পরোয়া করি না। না গরমেন্টো। না চৌধুরী, বলে কোমরে গামছা আঁটল হাশমত। বুড়ো হাশমতকে গামছা আঁটতে দেখে জোয়ান ছেলে তোরাব আলীও লাখিয়ে উঠল। বলল, টিনের ছাদ যদি না দিবার পারি অন্তত ছনের ছাদ তো দিবার পারম্পুর একডা। কি মিয়ারা?

হ-হ ঠিক। ঠিক কথাই কইছ আলির পো। গুঞ্জন উঠল চারদিকে।

ହାଶମତ ବଲଳ, ମୋକ୍ଷମ ପ୍ରଭାବ । ଛନେର ଛାଦଇ ଦିଯୁ ଆମରା । ଛନେର ଛାଦ ଦିତେ କଯ ଆଁଟି ଛନ ଲାଇଗବୋ? କୀ ପଣ୍ଡିତ,
ଚୁପ କଇରା ରାଇଲା କ୍ୟାନ । କଥ ନା?

କମପକ୍ଷେ ତିରିଶଟା ଲାଇଗବୋ । ମୁଖେ ମୁଖେ ହିସାବ କରେ ଦିଲ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ । ତକୁ ବଲଳ, ସାବଡ଼ାଇବାର କି ଆଛେ, ଆମି
ତିନଭା ଦିଯୁ ତୋମାଗୋରେ ।

ଆମି ଦୁଇଡା ଦିଯୁ ପଣ୍ଡିତ । ଆମାରଭାଓ ଲିସ୍ଟି କରୋ । ଏଗିଯେ ଏସେ ବଲଳ କଦମ ଆଲୀ ।

ତୋରାବ ବଲଳ, ଆମାର କାହେ ଛନ ନାହିଁ । ଛନ ଦିବାର ପାରମ୍ବୁ ନା ଆମି । ଆମି ବାଁଶ ଦିଯୁ ଗୋଟା ସାତ କୁଡ଼ି । ବାଁଶଓ ତୋ
ସାତ-ଆଟ କୁଡ଼ିର କମ ଲାଇଗବୋ ନା ।

ହ-ହ ଠିକ ଠିକ । ସବାଇ ସାଇ ଦିଲ ଓର କଥାଯ ।

ଦୁ ଦିନେର ମଧ୍ୟେ ଜୋଗାଡୁୟତ୍ର ସବ ଶେଷ ।

ବାଁଶ ଏଲ, ଛନ ଏଲ । ତାର ସଙ୍ଗେ ବେତଓ ଏଲ ବାଁଶ ଆର ଛନ ବାଁଧବାର ଜନ୍ୟ ।

ଆଯୋଜନ ଦେଖେ ଆନନ୍ଦେ ବୁକ୍ଟା ନେଚେ ଉଠିଲ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତେର । ଏତକଣ ଗଣ୍ଠିର ହୟେ କୀ ଯେନ ଭାବଛିଲ ଆମିନ ବେପାରି ।
ସବାର ଯାତେ ନଜରେ ପଡ଼େ ଏହନ ଏକଟା ଜାୟଗାୟ ଗଲା ଖାକରିଯେ ବଲଳ ମେ, ଜିନିସପନ୍ତର ତୋ ଜୋଗାଡ଼ କଇରାଛ
ମିଯାରା । କିନ୍ତୁକ ଯାରା ଗତର ଖାଇଟବୋ ତାଗୋରେ ପୟନା ଦିବୋ କେ?

ହଁ, ତାଇ ତୋ । କଥାଟା ଯେନ ଏକ ମୁହଁରେ ନାଡ଼ା ଦିଲ ସବାଇକେ ।

ହଠାତ୍ ହେ ହେ କରେ ହେସେ ଉଠିଲେନ ଶନୁ ପଣ୍ଡିତ । ଏଇଡା ବୁଝି ଏକଟା କଥା ଅହିଁ । ନିଜେର କାମ ନିଜେ କରମୁ ପଯନା
ଆବାର କେ ଦିବୋ? ବଲେ ବାଁଶ କେଟେ ଚାଲା ବାଁଧିତେ ଶୁରୁ କରଲେନ ତିନି । ବଲିଲେନ, ନାଓ ନାଓ ମିଯାରା ଶୁରୁ କରୋ ।

ହଁ । ଶୁରୁ କରୋ ମିଯାରା । ବଲଳ ତକୁ ଶେଷ ।

ଫୁଲେର ଖୁଟି ତୈରିର ଜନ୍ୟ ଲଦ୍ଧା ଏକଟା ଗାହେର ଗୁଡ଼ି ଖାଲପାର ଥେକେ ଟେନେ ନିଯେ ଏଲ ତୋରାବ । ହଁ, ଟାନ ମାରୋ ନା
ମିଯାରା । ଟାନ ମାରୋ ।

ହଁ । ମାରୋ ଜୋଯାନ ହେଇଯୋ—ସାବାସ ଜୋଯାନ ହେଇଯୋ । ଟାନ ମାରୋ । ଟାନ ମାରୋ ।

ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ । ଏତ ତଡ଼ବଡ଼ କରଲେ ଅୟ । ବଲଳ ବୁଲିର ବାପ । ହଁ ।

କାମେର ମାନୁଷ ହେଇଯୋ—ଆପନା କାମ ହେଇଯୋ । ଟାନ ଟାନ ।

ମରା ଚୌଧୁରୀ ହେଇଯୋ । ଚୌଧୁରୀର ଲାଶ ହେଇଯୋ । ହଠାତ୍ ଖିଲାଖିଲିଯେ ହେସେ ଉଠିଲ ତୋରାବ ଆର ତକୁ ।

ହାସଳ ସବାଇ ।

ଖକଖକ କରେ କେଶେ ନିଯେ ବୁଢ଼ୋ ହାଶମତ ବଲଳ, ମରା ଗରମେନ୍ଟୋ କଇଲାନା ମିଯାରା? ମରା ଗରମେନ୍ଟୋ କଇଲା ନା?

ହଁ । ମରା ଗରମେନ୍ଟୋ ହେଇଯୋ । —ଗରମେନ୍ଟୋର ଲାଶ ହେଇଯୋ । ଟାନ ଟାନ । କରମ ମାଝି ଚୁପ କରେ ଏତକଣ । ବଲଳ,
ଫୁର୍ତ୍ତିରେ କାମ କର ମିଯା ସିନ୍ଧି ପାକାଇବାର ବନ୍ଦୋବନ୍ଦ କରିଗା ।

ବାହ୍ୟା, ମାଜିର ପୋ, ବାହ୍ୟା । ଚାଲାଓ ଫୁର୍ତ୍ତି । କଲକଟେ ଚିତ୍କାର ଉଠିଲ ଚାରଦିକ ଥେକେ— ପାଟାରି ବାଡ଼ିର ରୋଗା
ଲିକଲିକେ ବୁଢ଼ୋ କାଦେର ବଞ୍ଚଟାଓ ଏସେ ଜୁଟେଛେ ମେଖାନେ । ତାକେ ଦେଖେ ଆମିନ ବେପାରି ଜୁ କୁଁଚକାଲୋ । କୀ ବଜ୍ର
ଆଲୀ । ସିନ୍ଧିର ଗଜେ ଧାଇଯା ଆଇଛ ବୁଝି? କଯ ଦିନେର ଉପାସ?

যত দিনের অই; তোমার তাতে কী? বেপারির কথায় খেপে উঠল কাদের বক্স। এত দেমাক দেহাও ক্যান মিয়া উপাস ক্যাডা না থাকে? তুমিও থাকো। সকলে থাকে।

ঠিক ঠিক। তফু সমর্থন করল তাকে। চৌধুরীরা ছাড়া আর সকলেই এক-আধ বেলা উপাস থাকে। এমন কোনো বাপের ব্যাটা নাই যে বুক থাবড়াইয়া কইবার পারব—জীবনে একদিনও উপাস থাকে নাই—হ।

তকু আর কাদেরের কথায় চুপসে গেল আমিন বেপারি।

তোরাব বলল, কী মিয়ারা, কিতা নিয়া তর্ক কর তোমরা। বেড়টা ধরো। টান মারো।

হঁ। মারো জোয়ান হেইয়ো—চৌধুরীর লাশ হেইয়ো—মরা চৌধুরী হেইয়ো। আহহারে চৌধুরী রে! খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই একসঙ্গে।

আকরম হাজি রুষ্ট হলো এদের ওপর। এত বাড়াবাড়ি ভালা না মিয়ারা। এত বাড়াবাড়ি ভালা না। এহনও চৌধুরীর জমি চাষ কইবা ভাত খাও। তারে নিয়া এত বাড়াবাড়ি ভালা না।

চাষ করি তো মাগনা চাষ করি নাকি মিয়া। তোরাব গেগে উঠল ওর কথায়। পান্ত্রায় মাইপা অর্ধেক ধান দিয়া দিই তারে।

পাকা অর্ধেক। বলল কাদের।

সক্ষ্য নাগাদ তৈরি হয়ে গেল স্কুলটা।

শেষ বান্টা দিয়ে চালার ওপর থেকে নেমে এলেন শনু পণ্ডিত।

লম্বা স্কুলটার দিকে তাকাতে আনন্দে চিকচিক করে উঠল কর্মক্লান্ত চোখগুলো। সৃষ্টির আনন্দ।

কদম আলী বলল, গরমেন্টোরে আর চৌধুরীরে আইনা একবার দেখাইলে ভালা অইবো পণ্ডিত। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি আমরা।

হ—হ। তাগোরে ছাড়াও চইলবার পারি। ঘাড় বাঁকাল শনু পণ্ডিত।

একটু দূরে সরে গিয়ে বটগাছের নিচে বসতেই কাঠের ফলকটার দিকে চোখ গেল তকু শেখের। আট-হ্যাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক-আঁটা ফলক। তার ওপর জুলু চৌধুরীর নামটা জুলজুল করে সকাল বিকেল।

ওইটা আর এইহানে ক্যান? বলল তকু শেখ। ওইটারে ফালাইয়া দে খালো; চৌধুরী খালে ভাসুক। হঠাৎ কী মনে করে আবার নিষেধ করল তোরাব। থাম—থাম—ফালাইস না। ইদিকে আন। কালো চারকোলি ফলকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে একখানা দা দিয়ে ঘষে ঘষে চৌধুরীর নামটা তুলে ফেলল তোরাব আলী। তারপর বুড়ো হাশমতের কক্ষে থেকে একটা কাঠকয়লা তুলে নিয়ে অপটু হাতে কী যেন লিখল সে ফলকটার ওপর।

শনু পণ্ডিত জিরোচিল বসে বসে। বলল, ওইহানে কী লেইখবার আছ আলীর পো। কিতা লেইখবার আছ ওইহানে?

পইড়া দেহ না পণ্ডিত, আহ পইড়া দেহ। আটহাত লম্বা কাঠের ওপর পেরেক-আঁটা ফলকটাকে যথাস্থানে গেঁড়ে দিল তোরাব।

অদুরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে মৃদুবরে পড়লেন পণ্ডিত। শনু পণ্ডিতের ইকুল। পড়েই বার্ধক্য-জর্জরিত মুখটা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল তাঁর। বিড়বিড় করে বললেন, ইতা কিতা কইবাছ আলীর পো। ইতা কিতা কইবাছ?

ঠিক কইবাছে। একদম ঠিক। ফোকলা দাঁত বের করে মৃদু হাসল বুড়ো হাশমত। লজ্জায় তখন মাথাটা নুয়ে এসেছে শনু পণ্ডিতের।

লেখক-পরিচিতি

জহির রায়হান ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ফেলী জেলার মজুপুর থামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ছোটোগল্প ও উপন্যাস লিখে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। ‘হাজার বছর ধরে’, ‘আরেক ফালুন’, ‘বরফ গলা নদী’ তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ ‘সূর্য গ্রহণ’। চলচ্চিত্রকার হিসেবেও জহির রায়হান প্রতিভাব বাস্তব রেখেছেন। ‘জীবন থেকে নেয়া’, ‘কাচের দেয়াল’ তাঁর উল্লেখযোগ্য চলচিত্র। এছাড়া বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র ‘Stop Genocide’ ও ‘Birth of a Nation’ তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বড়ো ভাই শহীদুল্লা কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে জহির রায়হান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিষ্ঠোজ হন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পটি পাকিস্তানি শাসনামলের পটভূমিতে রচিত। গল্পে দেখা যায়, এন্ট্রাঙ পাশ শনু পশ্চিম থামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য জমিদারের সহায়তায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাড়ে জরাজীর্ণ স্কুলটি ভেঙে গেলে শনু পশ্চিমসহ থামবাসী সংকটে পড়েন। থামের সম্পর্ক ব্যক্তি জুলু চৌধুরী কোনো সাহায্য করতে রাজি হন না। আশেপাশের থামেও আর স্কুল নেই। এ অবস্থায় সবাই সিন্ধান নেন একসঙ্গে পরিশ্রম করে নিজেদের স্কুল নিজেরাই পুনর্নির্মাণ করবেন এবং সক্ষ্যার মধ্যেই তাঁরা স্কুল ঘর তৈরি করতে সক্ষম হন। আবার তাঁদেরই উৎসাহে চারি তোরাব আলী স্কুলের নাম ফলকে আগের নামের পরিবর্তে লেখেন ‘শনু পশ্চিমের ইস্কুল’।

সবাই মিলে মানুষের জন্য ভালো কাজ করতে চাইলে যে কোনো বাধা সহজে অতিক্রম করা সম্ভব। আর সে কাজের সফলতায় বাড়ে মনের উদারতাও। গল্পটি সে ইঙ্গিত দেয়।

শব্দার্থ ও টীকা

পত্রন	— আরম্ভ, সূচনা।
গাঁয়ে	— থামে।
ন্যূজ	— কুঁজো।
কৃষ্ণ	— খসখসে।
বার্ধক্য	— বৃক্ষ অবস্থা।
জ্যামিতিক	— জ্যামিতির নকশা জাতীয়।
ফান্ড	— তহবিল। ইংরেজি Fund.
হেঁট	— মাথা নিচু করা।
এন্ট্রাঙ	— প্রাবেশিকা পরীক্ষা। এ সময়ের এসএসসি সমমানের।
তদারক	— দেখাশোনা।
গন্ধূর্ব	— জ্ঞানবুদ্ধিহীন।
অনাবাদি	— চাষ বা আবাদ করা হয় না এমন।

হুতোর	— কাঠের কাজ করা শ্রমিক।
ধেনো জমি	— যে জমিতে ধান হয়।
পেরেক আঁটা	— লোহার ছোট কাঁটা লাগানো।
জুলজুল	— উজ্জুল হয়ে থাকা।
আকস্মিক	— হঠাৎ।
জং	— মরিচা
আঁতকে	— চমকে।
স্টার্লিংশেন্ট	— প্রতিষ্ঠান। ইংরেজি Establishment.
বেগুলার	— নিয়মিত। ইংরেজি Regular.
হাঁসফাঁস	— অতিকষ্টে শ্বাস নেওয়া ও ত্যাগ করা।
অগত্যা	— নিম্নপায় হয়ে।
খুট	— কোনা, আন্তে।
কাচারি	— সরকারি অফিস।
গুঞ্জরন	— গুলগুল রব।
মোক্ষম	— জুতসই।
ছন	— শন। এক ধরনের ঘাস, যা দিয়ে আমে ঘরের ছাদ তৈরি করা হয়।
জোগাড়যন্ত্র	— আয়োজন বা প্রস্তুতি।
তড়বড়	— তাড়াতড়।
ফুর্তিছে	— আনন্দের সঙ্গে।
সির্নি	— শিরনি। এক ধরনের খাবার।
বান	— বেঁধে দেওয়া।

হেমোপ্যাথি, এ্যালাপ্যাথি

হাসান আজিজুল হক



তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমাদের গাঁয়ে দুজন ডাক্তার ছিলেন। একজন হোমিওপ্যাথি আর একজন এ্যালোপ্যাথি। গাঁয়ের লোক ঠিক ঠিক বলতে পারত না—একজনকে বলত হেমোপ্যাথি আর একজনকে বলত এ্যালাপ্যাথি। দুজনের চিকিৎসার ধরন ছিল বাঁধা। ওয়ুধও দিতেন একরকম।

হোমিওপ্যাথ অঘোর ডাক্তারের কাছে গেলেই একটুখানি সাদা ময়দার মতো গুঁড়োতে দু-তিন ফেঁটা স্পিরিট টপ টপ করে ফেলে তিন-চারটি পুরিয়া করে দিতেন। খেতে ভালোও লাগত না, মন্দও লাগত না। কখনো কখনো আবার শ্রেফ টিউবওয়েলের পানিতে দু-তিন ফেঁটা স্পিরিট মিশিয়ে দিয়ে বলতেন, 'যা, খাগে যা।'

ওষুধ হাতে নিয়ে, আমি হয়তো ফস করে জিজেস করে বসতাম, 'ডাক্তারবাবু ভালো হবে তো?' অঘোর ডাক্তার দাঁতমুখ খিচিয়ে বলে উঠতেন, 'ভালো হবে না মানে? ভালো হয়ে উপচে পড়বে। যা, 'ওষুধ খাগে।'

আমি বলতাম, 'পেটের ভেতর গরগন করে।'

'ও কিছু না, ব্যাঙ হয়েছে তোর পেটে।'

'ওরে বাবা, ব্যাঙ হয়েছে আমার পেটে! গৌ গৌ শব্দ হয় যে ডাক্তারবাবু।'

'ও কিছু না-ব্যাঙ ডাকে গৌ গৌ করে। আমার ওষুধ যেই এক পুরিয়া খাবি, দেখবি তখন ব্যাঙের লাফানি।'

'কী করে দেখব? ব্যাঙ যে পেটের ভেতরে।'

অঘোর ডাক্তার তখন বলতেন, 'ওরে বাবা, দেখবি মানে বুঝবি। বুঝবি ঠেলা।'

এই হচ্ছে আমাদের গাঁয়ের এক নব্বর ডাক্তার অঘোরবাবুর কথা।

এইবার দুই নব্বর তোরাপ ডাক্তারের কথা বলি। আগেই বলেছি, ইনি ছিলেন এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। কী করে যে তিনি ডাক্তার হয়েছিলেন, কেউ জানে না। শোনা যায়, বাল্যকালে তিনি নাকি এক বড়ো ডাক্তারের ছেঁকে সাফ করতেন। সে যাই হোক, তোরাপ ডাক্তারের একটা ছেঁট শেয়াল-রঙের বেতো ঘোড়া ছিল। তার সামনের পা-দুটি ছাঁদনা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত প্রায় সময়। এই বাঁধা পা নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে গাঁয়ের আশেপাশে চরে বেড়াত ঘোড়াটা। কারো ক্ষতি করতে দেখিনি কোনো দিন।

তোরাপ ডাক্তার খালি ডাক্তারিই করতেন না কিন্ত। নিজের হাতে হালচাব করতেন। বর্ষা আর শীতের সময় ডাক্তারির ধার ধারতেন না তিনি। বর্ষাটা হচ্ছে চাষবাসের সময় আর শীতকালটা হচ্ছে ফসল কাটার মরণুম। এই সময় রোগী মরে গেলেও তোরাপ ডাক্তারকে পাওয়া যাবে না।

বর্ষা আর শীতে গাঁয়ের লোকদের রেঁগী হয়ে ওয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। এই দুই সময়ে কাজ করতে না-পারলে পেটে ভাত জুটবে না। কাজেই রোগটোগ সব শিকেয় তুলে রেখে দিতে হতো তাদের বাধ্য হয়ে। তারপর শরৎকাল এলে তোরাপ ডাক্তারের মোটামুটি অবসর হতো আর গাঁয়ের লোকদেরও রোগী হয়ে ওয়ে থাকার একটু-আধটু মণ্ডকা মিলত।

এই সময়ের জন্যেই যেন গুণ পেতে থাকত ম্যালেরিয়া জ্বর। বাঘ যেমন গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে বাঁপিয়ে পড়ে শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরে, ঠিক তেমনি করে ম্যালেরিয়া জ্বর এসে গাঁয়ের গরিব লোকদের ওপর বাঁপিয়ে পড়ত। এটা ঘটত আর্দ্ধম মাস থেকে। ম্যালেরিয়ার মতো বাঘ জ্বর তখন আর কিছু ছিল না। ঘরে ঘরে মানুষ ছেঁড়া কাঁথা, ন্যাকড়া, ত্যানা গায়ে চাপিয়ে কেঁকাত। আর সে কী কাঁপুনি! কাঁপুনি থামাবার জন্যে পাথরের জাঁতা পর্যন্ত গায়ে চাপাতে দেখেছি।

এই সময়টায় ছিল তোরাপ ডাক্তারের মজা। ঘরে ঘরে লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে ধুঁকছে। চিকিৎসার জন্যে তোরাপ ডাক্তার ছাড়া গতি নেই। ম্যালেরিয়া পুরোনো হয়ে গেলে কিছুতেই সারতে চায় না। পেটের মধ্যে পিলে উচু হয়ে ওঠে, হাত-পা হয়ে যায় প্যাকাটির মতো সরু। তোরাপ ডাক্তারের এইরকম অনেক পিলে-ওষ্ঠা পুরোনো ম্যালেরিয়া-রোগী ছিল।

রোগের আর একটা সময় ছিল চোত-বোশেখ মাস। এই সময়টায় কলেরা আর বসন্ত হয়ে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যেত। ম্যালেরিয়া আর কলেরার সব রোগী তোরাপ ডাক্তারের। এখানে অঘোর ডাক্তারের কোনো ভাগ ছিল না। জ্বর হলে, সর্দি হলে, বেশি খেয়ে বা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পেট ছেড়ে দিলে লোক অঘোর ডাক্তারের কাছে যেত। আনা দুই পয়সা দিলেই, তিনি দিয়ে দিতেন দুই-তিন পুরিয়া ওষুধ। পয়সা দিতে না-পারলে ধারেও দিতেন। এমনকি একটা সাউ বা দুটো শশা নিয়ে গেলেও তিনি রোগী ফেরাতেন না।

অঘোর ডাক্তারের চাষবাসও ছিল না, ভিন্নগৈয়ে ‘কলে’ যাবার ঘোড়াও ছিল না। হোমিওপ্যাথি ওষুধ রাখার জন্য একটা কাঠের বাক্স ছাড়া চিকিৎসার সরঞ্জাম বলতে আর কিছুই ছিল না তাঁর। তবে ওরকম বাক্যবাচীশ লোক লাখে একটা মিলবে কিনা সন্দেহ।

তিনি বলতেন, ‘বলি, মরতে তোরা আমার কাছে আসিস কেন বল দিকিনি। তোরাপের কাছে যা না। তা তো যাবি না—গেলে যে ব্যাটা কসাই ঘাড়টি মটকে তাজা রক্ত খাবে তোদের। বলি, এ কী ডাক্তারি বল দিকিন তোরা? তুই বললি, আমার অসুখ করেছে, আর অমনি তোরাপ হয় জুরি বার করবে, না-হয় কোদাল বার করবে, না-হয় কুড়াল বার করবে...’

একজন রোগী হয়তো বাধা দিয়ে বলল, ‘না না ডাক্তারবাবু, তোরাপ ডাক্তার আবার কোদাল কুড়ুল কবে বার করবলে!’

‘ওই হলো, লাঙলের ফালের মতো ছুঁচওয়ালা একটা বোতল বার করল। কী? না ইঞ্জেকশন দেব, গজা কাটব, মারব, ধূরব। তারপর ওষুধ চাও, দেবে তোমাকে এক বোতল পিশাচের রক্ত। ওয়াক থু। যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি বিচ্ছিরি সোয়াদ-হ্যাছ্যা ছ্যাছ্যা! আর আমাদের হোমিওপ্যাথ কী করছে? বাঘ যেমন ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি করে একটি পুরিয়ার আমার এই ওষুধ তোমার পায়ের আঙুলের ডগা থেকে জীবাণু বাবাজিদের খেদাতে খেদাতে যাথার চুলের ডগা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। অথচ তুমি জানতেও পারছ না।’

সে বছর শরৎকালে ধান কেবল ডাঁশিয়ে উঠছে, ধানের ভেতর সাদা দুধ জমে চাল বাঁধছে, বেশ বরঝারে আবাহণয়া, আকাশভর্তি রোদ, একটু একটু ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে—এমনি সময়ে ছড়মুড়িয়ে চলে এল ম্যালেরিয়া জ্বর।

ব্যস, ম্যালেরিয়া জ্বরে লোক দমাদম বিছানা নিতে লাগল। ছেলে-বুড়ো কেউই বাদ যায় না। ম্যালেরিয়া যাদের পুরোনো হয়ে গেছে তাদের তো খুব মজা। ঠিক বেলা দশটার সময় চোখে সৃষ্টি একটু হলুদ হলুদ ঠেকে, তারপর গা একটু গরম হয়, চোখ দুটি সামান্য জ্বালা করে তবে তারপর হড় হড় করে এসে পড়ে জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে কী পিপাসা! ঘটি ঘটি পানি খেয়ে পিপাসা করে না। পানি পেটে গিয়ে গরম হয়ে যায়, তারপর গা-টা গুলিয়ে ওঠে, তারপরেই বমি। বমি হয়ে গেলেই আবার পিপাসা। আবার ঘটি ঘটি পানি খাওয়া তারপর আবার বমি। জ্বর কমে আসে আত্মে আত্মে। রাত দশটার দিকে একদম জ্বর চলে গিয়ে গা ঠাণ্ডা।

গাঁয়ের অর্ধেকের বেশি লোক ম্যালোরিয়া জ্বরে পড়ল। তোরাপ ডাক্তার হলুদ রঙের বড়ো বড়ো বিকট দাঁত বের করে এ্যাই বড়ো সিরিঙ্গ নিয়ে, রোগীদের বাড়ি বাড়ি ঘূরতে লাগলেন। দুই পকেট ভর্তি ম্যাপাক্রিন বড়ি। সে যে কি ভয়ানক বড়ি ভাবা যায় না। রোগী যেখানেই থাক, সে মাটির দাওয়াতেই হোক আর খোলা আকাশের নিচে উঠোনেই হোক বা ঘরের ভেতরেই হোক, গলায় স্টেথোটি ঝুলিয়ে ইনজেকশনের বাস্তি হাতে নিয়ে তোরাপ ডাক্তার ঠিক হাজির। লোকেই-বা আর কী করে? কাজেই বাধ্য হয়ে তোরাপ ডাক্তারকে ডাকতেই হয়। বেচারা অঘোর ডাক্তারের গুঁড়োতে যে কোনো কাজই হয় না।

সে যাই হোক, ঘরে ঘরে চুকেই গোদা গোদা এ্যাকাব্যাকা আঙ্গুল দিয়ে তোরাপ ডাক্তার রোগীর কঞ্জি চেপে ধরে কিছুক্ষণ নাড়ি পরীক্ষা করতেন।

রোগীরা সব বলাই সাধু। হয়তো জিজেস করল, “তবে কি ‘ম্যালোরি’ জ্বর ডাক্তার সাহেব?”

তোরাপ ডাক্তার দাঁত কড়মড়িয়ে বলতেন, ‘তাছাড়া আর কী হবে? এই যে দেখাচ্ছি মজা, একটি ইনজেকশনে ম্যালোরিয়ার ভূত ছাড়াব। এই বলে আশেপাশের লোকদের আদেশ দিতেন, ‘ধর তো এটাকে চেপে, সুইটা দিয়ে দিই একবার। আর দুটো টাকা রাখো এখানে আমার সামনে, আমার ফি আর ওষুধের দাম। উহু আগে টাকা রাখো, তারপর অন্য কাজ।’

এই বলে তোরাপ ডাক্তার একদিকের পকেটে টাকা দুটো ভরতেন, আরেক পকেট থেকে বের করতেন ইনজেকশন দেবার সিরিঙ্গ। কী প্রচণ্ড সিরিঙ্গ! আর তার ছুঁচ তো নয়, ঠিক যেন ঘোষের লাঙলের ফলা। লোকের গায়ে ফুঁড়তে ফুঁড়তে ছুঁচের মাথা গিয়েছে ভৌতা হয়ে। সেই ভয়ানক যত্ন দেখেই তো রোগী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করত। তোরাপ ডাক্তার চিকিৎসার করতেন, ‘ধর ধর, ঠিসে, চেপে ধর’-সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন ঘণ্টাগোছের লোক গিয়ে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরত রোগীকে। তারপর কোমরের কাপড়ের কষিটা খুলে তোরাপ ডাক্তার মাংসের মধ্যে প্যাট করে চুকিয়ে দিতেন সেই মোটা ছুঁচ। সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সমস্ত পা-টা যেত অবশ্য হয়ে।

এইরকম করে ইনজেকশন দিয়ে সে-বছর শরৎকালে তোরাপ ডাক্তার দুহাতে টাকা রোজগার করতে লাগলেন। ম্যালোরিয়ার প্রকোপ যত বাড়ে ততই বাড়ে তাঁর রোজগার। ইনজেকশন দিয়ে তিনি দু-তিনটে লোককে তো চিরদিনের জন্য খোঁড়া করে দিলেন। তাঁর ম্যাপাক্রিন বড়ি থেয়ে কয়েকজন তো চিরকালের জন্য কালা হয়ে গেল। তবু লোকে বাধ্য হয়ে তাঁর কাছেই যেতে লাগল। হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে ম্যালোরিয়ার মতো দুর্দান্ত জ্বর ঠেকানের সাধ্য ছিল না অঘোর ডাক্তারের। তাঁর কাছে আর কেউ যায় না। তাঁর সংসার চলাই দায় হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত কী আর করেন তিনি!

একদিন অঘোর ডাক্তার চুপিচুপি জেলা শহরে গিয়ে একটা সিরিঙ্গ আর কিছু কুইনাইন ইনজেকশন কিনে আনলেন। মনে মনে বললেন, তোরাপটার বড় বাড় বেড়েছে। খুব দু-পয়সা করে নিছিস, না? কিন্তু আমি হচ্ছি সব্যসাচী, সে খবরটা তো জানিস না তোরাপ। আমি দুই হাতে তির ছুঁড়তে পারি। ইচ্ছে হলে হোমিওপ্যাথি করব আবার ইচ্ছে হলে এ্যালাপ্যাথি ইনজেকশন দেবো। মনে মনে এইসব কথা ভেবে তিনি সিরিঙ্গের ছুঁচ কিনলেন খুব মিহি দেখে। কাউকে কোনো কথা না-বলে সরঞ্জাম সব কিনে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে এলেন সঙ্কেবেলা।

পরের দিন সকাল বেলায় মুখটি ধূয়ে দাওয়ায় কাঠের টুল পেতে কেবল বসেছেন তিনি—এমন সময় ইদরিস আলীর বাড়ি থেকে লোক এল। ইদরিস আর তার পুরো পরিবার অনেকদিন থেকে তাঁর গোণী। শত অসুখ-বিসুখে তারা কোনোদিন তোরাপ ডাঙ্গারের কাছে যায় না, বলে, হেমাপ্যাথির ওপর ওষুধ আছে নাকি ডাঙ্গারবাবু? মরলে আপনার হেমাপ্যাথি খেয়েই মরব, তবু তোরাপ ডাঙ্গারের হাতে জান দিতে পারব না।

ইদরিস আলীর বাড়ির লোকের কাছ থেকে অঘোর ডাঙ্গার শুল্লেন যে গত পাঁচ-সাত দিন থেকে ইদরিস নিদারশ্ন ম্যালেরিয়া জ্বরে বেঁশ। কিন্তু তোরাপ ডাঙ্গারের নাম করলেই তার হঁশ ফিরে আসছে আর তখন সে বলছে, ‘আমি অঘোর ডাঙ্গারের হেমাপ্যাথি খেয়ে মরব, কিছুতেই এ্যালাপ্যাথি চিকিছে করাব না।’

কথা শুনে অঘোর ডাঙ্গার মিটিমিট হেসে বললেন, ‘কেন রে, এ্যালাপ্যাথি চিকিছেটা খারাপ হলো কোথায়? তোরাপ হলো ডাকাত, ও আবার ডাঙ্গার হলো কবে? এখন থেকে আমিই এক-আধুট এ্যালাপ্যাথি করব ভাবছি।’ ইদরিসের বাড়ির লোকটা অবাক হয়ে বলল, ‘তুমি এ্যালাপ্যাথি করবে কী গো? তুমি আবার সুই দেবে নাকি?’ অঘোর ডাঙ্গার রেগে বললেন, ‘কেন, দেব না কেন? সব বিদ্যাই জানা আছে আমার বুবালি? চিকিছেটা তোরাপের লাঙ্গল চালানো নয়। কেমন মিহি সুই কিনেছি দেখবি। ইদরিসকে আজ ফুড়ব। তুই যা, আমি আসছি। আর শোন বাবা, দুটো টাকা আগে জোগাড় করে রাখিস। তোরাপও দু-টাকা করে নেয়, আমাকে দিবি না কেন?’ অঘোর ডাঙ্গার কুইনাইন ইনজেকশন দিবেন এই খবর দেখতে দেখতে সারা গাঁয়ে চাউর হয়ে গোল। গাঁয়ের যত সুষ্ঠু মানুষ ছিল, সব ছুটল ইদরিসের বাড়ির দিকে। ইদরিসের মেটেবাড়ির ছোট ঘরে আর তিলধারণের জায়গা নেই—একটো লোক কোমরে চাদর জড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচাতে লাগল, ‘এই, এই সব বাতাস ছেড়ে দাও, বাতাস আসতে দাও।’ কিন্তু কে কার কথা শোনে! অঘোর ডাঙ্গার হেমাপ্যাথি ছেড়ে ইনজেকশন দেবে—এ কী সোজা কথা!

রোগা অঘোর ডাঙ্গার বহু কষ্টে ঘরে ঢুকে, ট্যাক থেকে সিরিঞ্জ, ওষুধ এইসব বের করলেন। লোকজনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুই হাঁটু থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখে অবশ্য তমি করলেন, ‘ভিড় কমাও, আলো আসতে দাও তোমরা।’

এই কথা বলে বহু কষ্টে সিরিঞ্জের মাথায় সুচ লাগালেন, তারপর ওষুধ ভরে রোগীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ঠিক এই সময় জ্বরের ঘোর ভেঙে জ্বাফুলের মতো গোল দুটো চোখ মেলে ইদরিস বলল, ‘ডাঙ্গারবাবু শেষে আপনার এই কাজ! এই বলে ইদরিস চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে রাইল। অঘোর ডাঙ্গার বললেন, ‘ধর বাবা তোরা, ইদরিসকে একটু ধর।’ চোখ না-খুলেই ইদরিস বলল, ‘কাউকে ধরতে হবে না ডাঙ্গারবাবু, আপনি ইনজিশন দ্যান—বরঞ্চ আপনাকে ধরতে হলে ওদেরকে বলুন।’

হঠাৎ কেমন বোকার মতো অঘোর ডাঙ্গার হাসলেন, তারপর ইদরিসের কোমরের নিচে মাংসে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, ‘হেঁ হেঁ বড়ো মিহি কিনেছি ছুঁচটা, এই তুললাম’, এই কথা বলে সকলের দিকে চেয়ে থায় কাঁদো-কাঁদো গলায় আবার বললেন, ‘হেঁ হেঁ তোরাপের কম্ব নয়, তোমরা দ্যাখো একবার, এই তুললাম সিরিঞ্জ,

এইবার, এইবার’—বলেই প্যাট করে সিরিজের সুচ চুকিয়ে দিলেন ইদরিসের কোমরের মাংসে। হাত কাঁপতে লাগল তাঁর, বারবার বলতে লাগলেন, ‘গভীর করে ফুড়তে হবে, গভীর করে ফুড়তে, এই যাহ।’ পট করে একটা আওয়াজ উঠল আর হাহাকার করে উঠলেন অঘোর ডাঙ্কার, ‘হায় হায়, ছুঁচ ভেঙে গেছে, ছুঁচ ভেঙে গেছে, গেল গেল, সর্বোনাশ হলো, হায় হায়...।’

সুচটা তখন মাংসের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। অঘোর ডাঙ্কারের শীর্ষ দুই হাত আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটাকে। তখন কোথা থেকে একটা জোয়ান ছেলে ছুটে এসে দাঁত দিয়ে কামড়ে তুলে ফেলল সুচটা ইদরিসের কোমর থেকে। সবাই চুপ করে আছে—ছেলেটা দাঁত থেকে খুলে হাতে নিল সুচটা, অঘোর ডাঙ্কারের দিকে চেয়ে বলল, ‘এই যে ডাঙ্কারবাবু পেয়েছি।’ অঘোর ডাঙ্কার দেখতে পেলেন না। ক্ষোভে দুঃখে তখন তাঁর চোখে অশ্রু ঢেল নেমেছে।

লেখক-পরিচিতি

হাসান আজিজুল হকের জন্ম ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামে। তিনি বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিশু-কিশোর রচনাসহ তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই ডজনেরও অধিক। হাসান আজিজুল হকের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি ‘আতজা’ ও একটি করবী গাছ’ ও ‘জীবন ঘষে আগুন’, উপন্যাস ‘আগুনগাহি’ ও ‘সাবিত্রী উপাখ্যান’ এবং শিশুতোষ-গ্রন্থ ‘লালঘোড়া আমি’ ও ‘ফুটবল থেকে সাবধান’ অভূতি। সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমিসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিসমূহ পেয়েছেন একুশে ও স্বাধীনতা পদক।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এ গল্পে লেখক সরস ভাষায় গ্রাম্য দুর্জন হাতুড়ে ডাঙ্কারের প্রতিষ্ঠিতার কথা বলেছেন। হোমিওপ্যাথ ডাঙ্কারের নাম ছিল অঘোর এবং এ্যালোপ্যাথ ডাঙ্কারের নাম ছিল তোরাপ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামের ছেলেবুড়ো সকলে কাতর হলে তোরাপের আয় রোজগারের সুবিধা হতো; আর অঘোর ডাঙ্কারের কাছে কেউ যেতই না। রোগীর অভাবে অঘোর ডাঙ্কারের সংসার চলাই দায় হয়ে উঠল। তাই অঘোর ডাঙ্কার একদিন গোপনে বাজার থেকে সিরিঙ্গ আর কুইনাইন ইনজেকশন কিনে এনে এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসা শুরু চেষ্টা করলেন। অঘোর ডাঙ্কার কাঁপা কাঁপা হাতে ইদরিস নামের এক রোগীর কোমরের গভীর মাংসে সিরিজের সুচ চুকিয়ে দিতে গিয়ে সুচটা ভেঙে ফেললেন। ওই সময়ে একটি বৃক্ষমাল ছেলে বিষয়টার ভয়াবহ পরিণতি আঁচ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়ে সুচটা বের করে নেয়। লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ, অপমান ও অভিমানে অঘোর ডাঙ্কারের চোখে অশ্রু ঝারে। তিনি নিজের ভুলটা বুঝাতে পারলেন।

যার যেটা কাজ সেটাই করা উচিত, নয়তো দুঃখ ও অপমান বয়ে বেড়াতে হয়; গল্পাটিতে এ ভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দার্থ ও টাকা

হোমিওপ্যাথ	— রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুর ছেটো অংশ দিয়ে ওই রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা-প্রণালি। ইংরেজি Homoeopath.
এ্যালোপ্যাথ	— ইউরোপীয় আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালি বিশেষ। ইংরেজি Allopath.
স্পিরিট	— একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। ইংরেজি Spirit.
শ্রেফ	— শুধু।
বেতো	— বেতের মতো।
ছাঁদনা	— এক ধরনের দড়ি। গরু বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়।
শিকেয় তোলা	— শিকা হলো দড়ি দ্বারা নির্মিত খলের মতো বস্তু, যেখানে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ছাঁড়ি-পাতিল বুলিয়ে রাখা হয়। এখানে ‘শিকেয় তোলা’ বাগধারা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ ঝুঁগিত বা মুলতবি রাখা।
মণ্ডকা	— সুযোগ।
ওঁৎ	— পূর্বসন্তুতি নিয়ে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করা।
টুটি	— গলা বা কর্ণনালি।
জাঁতা	— শস্য ওঁড়া করার ভারি ঘন্টা।
পিলে	— গীৱা। পাকস্থলির বামপাশে অবস্থিত মানবদেহের একটি অঙ্গ।
পঁয়াকাটি	— পাটকাটি। ছাল ছাড়ানো শুকনো পাটগাছ।
পুরিয়া	— মোড়ক। হোমিওপ্যাথি ওযুধ পরিবেশনের জন্যে ব্যবহৃত প্যাকেট।
কল	— ডাক, আহ্বান। এককালে ডাকারকে টাকা দিয়ে বাড়িতে ডেকে আনাকে ‘কল’ বলা হতো। ইংরেজি call.
বাক্যবাচীশ	— বাকপটু।
উঁশিয়ে	— প্রায় পাকা।
ম্যাপাক্রিন	— একধরনের ঔষধ। ইংরেজি mapacrine.

- স্টেথো — স্টেথোকোপ, হৃৎস্পন্দন মাপার যন্ত্র। ইংরেজি Stetho.
- সিরিঙ্গ — ইনজেকশন দেওয়ার উপযোগী সুচ। ইংরেজি Syringe.
- বলাই সাধু — শ্রীকৃষ্ণের বড়ো ভাই বশরাম। এখানে ভালো মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- মুণ্ডগাত — শিরস্ত্বে। এখানে ‘অভিশাপ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- কুইনাইন — ম্যালেরিয়া-জ্বরের ঔষধবিশেষ। ইংরেজি Quinine.
- সব্যসাচী — দুই হাতে সমান পারদশী। এখানে ‘দক্ষ’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ট্যাক — কোমর। লুঙ্গি কোমরে বাঁধার সময় যে খলে আকৃতি অংশে টাকা-কড়ি রাখা হয়।
- তথি — বকারকা করা।
- অঁতিপাতি — পুঞ্জানুপুঞ্জিভাবে।
- ইনজিশন — ‘ইনজেকশন’-এর আঞ্চলিক রূপ। ইংরেজি Injection.

ডেভিড কপারফিল্ড

চার্লস ডিকেন্স

রূপান্তর : আখতারমজ্জামান ইলিয়াস



আমার বাবাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্মের ছয় মাস আগে আমার বাবার চোখ থেকে এই পৃথিবীর আলো চিরকালের জন্য মুছে গিয়েছিল, তিনিও আমাকে দেখেননি।

আমি থাকতাম আমার মাঝের সঙ্গে। মা হালকা গড়নের মহিলা, আমার এক দাদি তাঁকে বলতেন মোমের পুতুল। মার স্বভাবটি কোমল প্রকৃতির, তিনি কখনো রাগ করতে পারতেন না। আমাদের বাড়িতে কাজ করত পেগোটি বলে একটি মেয়ে, ওর সঙ্গেও মাকে কোনোদিন উচু গলায় কথা বলতে শুনিনি। পেগোটি থাকত আমাদের পরিবারের একজন হয়ে, আমাদের খেলাধুলা সব একসঙ্গে, খাওয়াদাওয়াও একসঙ্গে, একই টেবিলে। পড়াশোনা আমি করতাম মাঝের কাছেই, মাঝের কাছে শেখাপড়ার ব্যাপারটা খেলাধুলার মতোই ভালো লাগত। মা আর পেগোটির সঙ্গে আমার বেশ ভালোই কাটছিল।

আমার এই ছিমছাম সুখের জীবনে প্রথম ধীকা আসে আমার আট বছর বয়সে। মা একদিন ফের বিয়ে করলেন। আমার সৎ বাবা মার্ডস্টোন সাহেব দশাসই পুরুষ, তাঁর মত জুলফি, পুরু গৌফ এবং জোড়া ভুক্ত। তাঁকে দেখে প্রথম থেকেই আমার ঠিক নিজের লোক বলে মনে হয়নি। এর ওপর আমাদের সঙ্গে ছায়াভাবে বাস করতে এলেন তাঁর বোন। ভাইবোনের চেহারায় খুব মিল, গলার স্বরও থায় একই রকম। ভাইবোনের স্বভাবও

একইরকম— যেমন মার্ডস্টোন সাহেব তেমনি তাঁর বোন—দুজনেই কড়া মেজাজের মানুষ, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দুষ্টি তাঁরা বরদাশত করতে পারতেন না, আসার পর থেকেই আমার কথাবার্তায়, আদব-কায়দায় খুঁত বার করার জন্য একেবারে হন্তে হয়ে উঠলেন।

এমনকি আমার লেখাপড়া শেখাবার কাজটিও মার্ডস্টোন সায়ের নিজের হাতে নেওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠলেন। আমি কিন্তু কোনো ব্যাপারেই তাঁর কাছে হেবতে চাইতাম না, পড়াশোনা করে পড়া দিতে যেতাম মাকেই। কোথাও আটকে গেলে মা আদর করে বলতেন, ‘বাবা ডেভি, মনে করতে পারছ না? একটুখানি চেষ্টা করে দেখো তো।’

মার্ডস্টোন সাহেবের কর্কশ গলায় বলতেন, ‘আহ্। ক্লারা, তুমাবে বললে হবে না।’

মার্ডস্টোন সাহেবের বোনও একই রকম কষ্টে ভাইরের সমর্থনে এগিয়ে আসতেন, ‘সোজা বলে দাও, পড়া মুখযুক্ত করে আসুক।’

এখন তাদের মুখের ওপর কিছু বলা আমার মায়ের সাথ্যে কুলায় না। আমি আবার বই নিয়ে বসি। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, মায়ের কোল যেঁয়ে বসে যে কাজটি আমি পান্নির মতো সহজ করে বুঝতে পারি, যে পড়া অবলীলায় বলে যাই, মার্ডস্টোন সাহেবের কি তাঁর বোন সামনে থাকলে সেটি আর হয়ে ওঠে না। মার্ডস্টোন সাহেবের জিজেস করলে আমার জানা অঙ্ক ভুল হয়, মুখযুক্ত পড়া ভুলে যাই।

ঠিকমতো পড়া দিতে পারলেও তাঁদের মন পাওয়া যায় না, মার্ডস্টোন সাহেবে এমন সব কঠিন অঙ্ক করতে দিতেন যে আমার একেবারে আহি আহি অবস্থা হতো। তাঁদের এড়িয়ে চলার জন্য আমি গিয়ে চুক্তাম আমার ঘরের লাগোয়া ছোটো ঘরে, এখানে আমার বাবার কয়েকটি বই স্থৃত করে রাখা ছিল, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এসব কেউ ছুঁয়েও দেখত না। এখানে একা একা বসে আমি ‘রডারিক ব্যানডম’, ‘টম জোনস’, ‘দি ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড’, ‘ডন কুইকসোট’, ‘রবিনসন ত্রুসো’, ‘আরব্য রজনী’—এসব বইপত্র পড়তাম। কিন্তু মার্ডস্টোন সাহেবের হাত থেকে তবু আমার রেহাই নেই। আর আমার এমন অবস্থা যে তাঁর হাতে পড়লেই পড়া আর বলতে পারি না।

একদিন এমনি কী ভুল হয়ে গেল, মার্ডস্টোন সাহেব আমার ঘরে চুকলেন হাতে বেত নাচাতে নাচাতে। পেছনে তাঁর বোন। প্রায় ফৌজি কায়দায় দুজনকে চুকতে দেখে মা তরে কাঁপছিলেন। আমার ওপর হঠাৎ করে বেতের বাড়ি পড়তে শুরু করলে আমি চিৎকার করে বললাম, ‘পায়ে পড়ি, মারবেন না, মারবেন না। আমি তো আজ সারাদিন ধরে পড়লাম, আগনাদের দুজনকে দেখেই সব ভুলে গিয়েছি, আগনাদের দেখলেই আমার জানা পড়া গুলিয়ে ফেলি।’

‘তাই?’ বাজুর্বাই গলায় মার্ডস্টোন সাহেবে বললেন, ‘সব গুলিয়ে ফেলো, নাঃ? দেখি কি করে মনে রাখতে পারো, সেই ব্যবস্থা করি।’

আমার মাথাটা তিনি আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি মাথা গলিয়ে তাঁর হাত থেকে মুক্ত হলে তিনি আমার মুখ চেপে ধরে পিঠে সপাং সপাং করে বেতের কয়েকটা ঘা মারলেন, আমি আর সহ্য করতে না পেরে আমার মুখে চেপে ধরা তাঁর হাতের বুড়ো আঙুলে এ্যারসা জোরে এক কামড় বসিয়ে দিলাম যে যন্ত্রণায় তিনি একেবারে চিংকার করে উঠলেন। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাঁর আসল মার, বেতের মৃহুর্মুহু আঘাতে আমার শরীর একেবারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। ভাবলাম আজ আমি একেবারে মরেই যাব। মারতে মারতে মার্ডস্টোন সাহেবও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমার ঘরে আমাকে ঠেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হলো। অঙ্ককার গাঢ় হয়ে এল, কিন্তু ঘরে আমার একটি বাতিও জ্বলল না। এর মধ্যে মিস মার্ডস্টোন রুটি আর কয়েক টুকরো গোশত দিয়ে পিয়েছিলেন। কিন্তু অঙ্ককার হওয়ার পর আর কেউ এল না। আমি একা একাই শুয়িয়ে পড়লাম। এইভাবে পাঁচদিন কাটল, আমার মনে হলো, মার্ডস্টোন সাহেবের হাত কামড়ে দিয়ে আমি বোধহয় ভয়ানক একটি অগ্রাধ করে ফেলেছি। আমার মা একদিনও এলেন না, তাঁকে পেলেও না হয় আমি মাঝ চাইতে পারতাম।

পেগোটি আমাকে চুপচুপ করে খবর দিয়ে যায় যে, লন্ডনের একটি আবাসিক স্কুলে আমাকে ভর্তি করার আয়োজন চলছে। দেখতে দেখতে আমার বিদায় নেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল। আমি বিদায় নেওয়ার সময় মার গলা বেশ ভারী হয়ে আসছিল। এতে মার্ডস্টোন সাহেব এবং তাঁর বোন দুজনেই খুব বিরক্ত। আমার জন্যে মা যে একটু প্রাণ খুলে কাঁদবেন এঁরা সে অধিকারটুকুও তাঁকে দিতে রাজি নন।

ঘোড়ার গাড়ি যাত্রা শুরু করল। পকেট থেকে রুমাল বের করে আমি চোখে চেপে ধরলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি তা ভিজে একেবারে চপচপে হয়ে গেছে। আধমাইল পথ পেরিয়ে গাড়িটা একটু থামে, থামতে না থামতে পথের ধারে বোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে পেগোটি। এক লাফে গাড়িতে উঠে সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বাড়িতে আমাকে আদর করা দূরে থাক, বেচারি কথা বলার সুযোগটা পর্যন্ত পায় না। আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটি কাগজের টুকরো আমার হাতে তুলে দিয়ে আর একবার সে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর গাড়ি থেকে নামবার আগে গাড়িতে একটি ব্যাগ রেখে দিল।

গাড়ি ফের গড়িয়ে চলতে শুরু করলে আমি ব্যাগটা খুলে দেখি এক টুকরো কাগজে আমার মার লেখা, ‘ডেভিডে
অনেক আদর ও ভালোবাসা।’ কাগজটির সঙ্গে কয়েকটি টাকা।

কিছুক্ষণ পর একই একাগাড়ি থেকে নেমে উঠতে হলো লন্ডনগামী কোচে। বিকাল তিনটোয় ঘোড়ায় টানা সেই
কোচ ছাড়ল, লন্ডন পৌছবার কথা সকাল আটটায়। কোচে রাত্রিটা কিন্তু তেমন আরামে কাটেনি। দুইপাশে দুজন
ভদ্রলোক ঘুমোতে শুরু করলেন, আমার দুই ঘাড় হলো তাঁদের দুজনের বালিশ। আমার অবস্থা একেবারে
শোচনীয়।

শেষ পর্যন্ত সূর্য উঠল। আমার দুই দিকের দুই সহযাত্রীর ঘূম ভাঙল। কিছুক্ষণ পর দূর থেকে লঙ্ঘন শহর দেখে আমার যে শিহরন হলো তা আমি বুবিয়ে বলতে পারব না। এই আমাদের স্থানের লঙ্ঘন শহর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, এখানে আমি একেবারে একা। রবিনসন কুসোর চাইতেও একা। রবিনসন কুসো যে একা তা তো আর কেউ দেখেনি, আর এই জনাকীর্ণ শহরে আমার একাকিত্ব যেন সকলের চোখে পড়ছে।

নানারকম বামেলার পর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। ‘তুমই তো নতুন এলে?’ আমার দিকে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, ‘এসো, আমি সালেম হাউসের শিক্ষক।’ আমি জানি যে সালেম হাউসে আমাকে ভর্তি করা হয়েছে। কিন্তু ওই কুলের এই শিক্ষকের চেহারা একটুও আকর্ষণীয় নয়। দেখতে তিনি বড়ো ঝোঁকা, গায়ের রং ফ্যাকাশে, তাঁর পোশাকও বিবর্ণ, প্যান্টের ঝুল ও শার্টের হাতা বেশ খাটো। আমার হাত ধরে তিনি চলতে শুরু করলেন। এদিকে আমার তখন খুব খিদে পেয়েছে, শরীর বেজায় ঝাঁক। খিদের কথা বলতে আমার বাধো-বাধো ঠেকছিল, তবে আমার নতুন শিক্ষকের চেহারা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি বললাম, ‘কাল দুপুরের পর থেকে কিছু খাইনি।’ আরো সাহস করে বললাম, ‘কিছু কিনে খেলে ভালো হতো।’ তিনি রাজি হলে একটা দোকান থেকে ডিম আর মাংস কিনে নিলাম। এখন এগুলো খাব কী করে? আমার নতুন শিক্ষক একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে কোথায় যে নিয়ে চললেন আমি ঠিক বুবাতেও পারছিলাম না। রান্তায় সাংঘাতিক কোলাহল, হইচই, এইসব আওয়াজে আমার মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল, লঙ্ঘন ভ্রিজ পেরোবার সময় ঘূমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ চলবার পর শিক্ষক আমাকে নিয়ে নামপেন। তাঁর সঙ্গে আমি যে ছোটো ঘরটিতে চুকলাম সেটি বেশ গরিব কোনো মানুষের বাসস্থান, দেখেই বোৰা যায় এটা কোনো অনাথ আশ্রমের অংশ। আবার একটি পাথরে খোদাই করা রয়েছে, ‘পঁচিশ জন দরিদ্র রমণীর জন্য প্রতিষ্ঠিত।’

ছেটো সঁ্যাতসেতে ঘরটিতে চুকতেই বৃক্তা এক মহিলা খুশিতে ঢেকে উঠলেন, ‘বাবা চার্লি।’ কিন্তু আমার দিকে তাঁর চোখ পড়তেই একটু থতমত খেয়ে চুপ করলেন। নতুন শিক্ষক তাঁর হাতে ডিম দিলে সম্প্যানে সেটা ভেজে দিলেন, মাংসের টুকরো সেন্স করে দিলেন। আমি তো তখন কুধার্ত, গোঘাসে ওইসব খাচ্ছি তো শুনি যে বৃক্তা মহিলা শিক্ষককে বলছেন, ‘বাশিটা সঙ্গে থাকলে একটু বাজাও না।’

কোটের ভেতর হাত দিয়ে শিক্ষক বাশির তিনটে টুকরো বের করলেন, টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ বাশি ঠিক করে নিয়ে তিনি বাজাতে শুরু করলেন।

তিনি কী সুর বাজালেন আমি জানি না, কেমন বাজিয়েছেন তাও বুবিনি, কিন্তু তাঁর বাশির তীব্র ধ্বনি আমার বুকে দাক্রণ প্রতিধ্বনি তুঙ্গল, আমার সমস্ত বেদনার কথা যেন খুড়ে ওপরে উঠে এল, আমার সব কষ্টের কথা মনে পড়ল, শেষপর্যন্ত চোখের পানি আর চেপে রাখতে পারলাম না। এর মধ্যে ওই মহিলা এবং আমার নতুন শিক্ষকের চেহারার মিল দেখে আমি বুবাতে পাচ্ছিলাম যে এরা মা এবং ছেলে। আমার শিক্ষকের মা এত গরিব কেন, দাতব্যত্বনে বাস করেন কেন—এসব থক্ক মনে একটু উকি দিলেও আমার সমস্ত মাথা জুড়ে তখন কেবল বাশির সুর। আমার আল্টে আল্টে ঘূম পেতে লাগল। যখন ঘূম ভাঙল, দেখি আমি ঘোড়ার গাড়িতে বসে রয়েছি, পাশে পায়ের ওপর আড়াআড়িভাবে আরেকটি পা রেখে বাশি বাজিয়ে চলেছেন আমার নতুন শিক্ষক। আমি ফের ঘূমিয়ে পড়ি।

গাড়ি থামলে স্যার আমাকে নিয়ে নিচে নামলেন। সামনে উঁচু দেওয়ালে শক্ত একটি বাতি, সাইনবোর্ডে বড়ো বড়ো করে লেখা 'সালেম হাউস'। এটাই তাহলে আমার নতুন স্কুল।

দরজায় কড়া নাড়লে শক্তসমর্থ একটি লোক বেরিয়ে আসে। ঘাড়টা ঝাঁড়ের ঘাড়ের মতো মোটা, একটা পা কাঠের, ছোটো করে কাটা মাথার চূল। স্যার আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে সে আমাকে ভালো করে দেখল। লোকটি ভেতর থেকে এক জোড়া জুতো এনে সামনে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'মেল সাহেব, মুচি আপনার জুতো ঠিক করতে চায় না। এটার মেরামত করার কিছু নেই, তালি দিতে দিতে একেবারে শেষ হয়ে গেছে।'

জুতোজোড়া হাতে আমার নতুন শিশুক মেল সাহেব ওপরে উঠতে লাগলেন, পিছে পিছে আমি। দোতলায় উঠে শেব প্রাঞ্জের ঘরে হাঁটছি, হঠাৎ চোখ পড়ল একটি বোর্ডের দিকে, বোর্ডে সুন্দর করে লেখা 'সাবধান এটা কামড়ায়।' আশেপাশে নিচয় কোনো কুকুর আছে এবং সেটা অবশ্যই কামড়ায় এই ভেবে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মেল সাহেব পেছনে তাকিয়ে বললেন, 'কী হলো?'

'এখানে বোধ হয় কুকুর আছে স্যার।' বোর্ডের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি গল্পীর গলায় বললেন, 'কুকুর নয়, কপারফিল্ড। আমাকে বলা হয়েছে, ওই বোর্ডটা যেন তোমার পিঠের সঙ্গে আটকে দিই। এখানে এসে প্রথমেই তোমার মনটা খারাপ করে দিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু এটা আমাকে করতেই হবে।'

আমার সৎ বাবার হাতের আঙুলে কামড় দিয়েছিলাম, সেই ধর তাহলে এখানেও পৌছে দেওয়া হয়েছে, তার শান্তি কি আমাকে পেতে হবে এভাবে? সত্যি, আমি একেবারে দমে গেলাম। ক্লাসের সহপাঠীরা আমার পিঠ দেখবে আর আমাকে নিয়ে যে কি ঠাণ্ডা বিদ্রূপ করবে ভাবতেই লজ্জায়, ভয়ে আমি একবোরে কুঁকড়ে যেতে লাগলাম।

স্কুলের মালিক এবং প্রধান ক্রিকল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর সুন্দর বৈঠকখানায় বসেছিলেন মিসেস ক্রিকল আর তাঁদের মেয়ে। এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম কাঠের পা-ওয়ালা ওই লোকটিকে।

ক্রিকল সাহেবের মুখ টকটকে লাল, মনে হয় সবসময় সেখানে আগুন জুলছে, চোখজোড়া তাঁর ছোটো, কপালের রংগন্তো সব স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এর নামে কোনো রিপোর্ট আছে?'

'না স্যার', কাঠের পা-ওয়ালা জবাব দিল, 'নতুন এসেছে, এখন পর্যন্ত তেমন কিছুই করার সুযোগ পায়নি।'

'এদিকে এসো।' ক্রিকল সাহেব আমাকে এই আদেশ দিলে কাঠের পা-ওয়ালা বলে ওঠে, 'এদিকে এসো।'

আমি তাঁর দিকে এগিয়ে এলে আমার কান ধরে ক্রিকল সাহেব বললেন, 'তোমার সৎবাবাকে আমি চিনি, শক্ত স্বভাবের মানুষ। তা তিনিও আমাকে ভালো করেই চেনেন। তুমি আমাকে চেনো?'

'না স্যার।'

'চেনো না, না?' আমার কানে একটা মোচড় দিয়ে তিনি বললেন, 'চিনবে হে চিনবে!'

ক্রিকল সাহেবের এই ব্যবহারে আমার যতই খারাপ লাগুক, অনেক বেশি ভয় করতে লাগল ঝুল ঝুলালে ছেলেদের আচরণটা কী হবে সেই ভাবনা করে। তো একদিন ঝুল ঝুল, ছেলেরা হোস্টেলে এসে পড়ল। ছেলেরা যথারীতি আমার পেছনে লাগল, কারো পিঠে অমনি একটা বোর্ড সাঁটা থাকলে কিছু বাকি তো তাকে পোয়াতে হবেই। তবে যা ভেবেছিলাম সে রকম ভয়াবহ গোছের কিছু ঘটল না। 'সাবধান, এটা কামড়ায়' বলতে বলতে ছেলেরা আমাকে খ্যাপাত, কেউ কেউ আঁতকে ওঠার ভাব করত, আবার বুনো মানুষের মতো নাচতে নাচতে 'কুকুর কুকুর' বলে চিৎকারণ করেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই তেমন উৎপাত করেনি। এর ওপর ক্রিকল সাহেব ক্লাসে একদিন আমাকে বেদম মারতে গিয়ে দেখলেন বে পিঠে সাঁটা ওই বোর্ডের জন্য বেতের বাড়ি ঠিক জুতমতো লাগানো যাচ্ছে না, তাই তিনি নিজেই ওটা খুলে ফেললেন।

তবে ছেলেদের উৎপাতের হাত থেকে বাঁচতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে। ওর নাম জে. স্টিরফোর্ড। আমার চেয়ে অনেক বছর বড়ো এই ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর, ছাত্র হিসেবেও মেধাবী বলে তার বেশ নামডাক রয়েছে। তার প্রতি ক্রিকল সাহেবের একটু গক্ষপাতিত্বও সক্ষ করা যায়। তো এই ছেলেটি প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে বেশ ভাব করে ফেলে। 'রবিনসন ত্রুসো,' 'আরব্য রজনী,' 'ডল কুইকসোট'-এসব বইয়ের গল্প আমি বেশ জরিয়ে বলতে পারতাম বলে ছেলেরা অনেকেই আমার পাশে ভিড় করত। স্টিরফোর্ড আর আমি রাত্রে পাশাপাশি বিছানায় ঘুমাতাম, ঘুমাবার আগে তাকে রোজ ওইসব গল্প বলে শোনাতে হতো। এমনিতে স্টিরফোর্ড আমাকে ভালোবাসত আর স্বয়ং ক্রিকল সাহেব তাকে সমীহ করতেন বলে কোনো ছেলে আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পেত না। কিন্তু স্টিরফোর্ড কখনো কখনো বড়ো নিষ্ঠুর হয়ে উঠত।

একদিন বিকালবেলার কথা আমার খুব মনে পড়ে। মেল সাহেবের ক্লাসে গোলমাল হচ্ছিল। মেল সাহেব এমনিতে নিরীহ গোছের মানুষ, সহজে বড়োগলা করে কথা বলতে পারতেন না। সেদিন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়া দিচ্ছিলাম। ছেলেরা গ্রাম সবাই নিজেদের মধ্যে কথা বলেই চলেছে, ক্লাসে যে একজন শিক্ষক আছেন তা বোঝাই যাচ্ছিল না। মেল সাহেবের সহের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি হঠাত করে চিৎকার করে ধমক দিলেন, 'চুপ। চুপ কর।' তাঁর মুখে এরকম ধমক শুনতে অনভ্যস্ত ছেলেরা অবাক হয়ে চুপ করে গেল। শেষ সারিতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে শিস দিচ্ছিল স্টিরফোর্ড, সে কিন্তু থামল না, শিস দিয়েই চলল। মেল সাহেব বললেন, 'স্টিরফোর্ড, চুপ কর।'

'আপনিই চুপ করুন।' স্টিরফোর্ড পালটা ধমকের সুরে বলল, 'জানেন আপনি চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলছেন কার সঙ্গে?'

'স্টিরফোর্ড, তুমি কি ভেবেছ তোমার বেঘাদবি আমি গক্ষ করিনি? হোটো হোটো ছেলেদের তুমি বারবার উসকে দিচ্ছ, আমি কি দেখছি না ভেবেছ?' বলতে বলতে মেল সাহেবের ঠোটজোড়া কাঁপছিল, 'সবাই জানে যে এখানে তোমার দিকে গক্ষপাতিত্ব করা হয়, সেই সুযোগ নিয়ে তুমি একজন অদ্বোকেকে এভাবে অপমান করতে সাহস পাও?' ১০

'ভদ্রলোক?' স্টিরফোর্ড মহা বিপ্রিত হবার ভান করে বলল, 'ভদ্রলোকটি কোথায় বলুন তো?'

স্টিরফোর্ড, একজন হতভাগ্য মানুষকে এভাবে অপমান করে তুমি খুব ইতর ব্যবহার করলে। তুমি খুব অভ্যন্তর আচরণ করলে, স্টিরফোর্ড।' বলতে বলতে মেল সাহেব আমার পিঠে আগতো করে চাপ দিয়ে বললেন, 'কপারফিল্ড, পড়া বলে যাও।'

স্টিরফোর্ড বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, 'শুনুন, একজন ভিখেরির মুখে এরকম কথা মোটেই শান্তায় না।'

হঠাৎ ঘরের ভেতর ক্রিকল সাহেবের ফ্যাসফেসে গলায় আওয়াজ গর্জে উঠল, 'মেল সাহেব, কী হচ্ছে?' মেল সাহেব চমকে উঠলেন। স্টিরফোর্ড বলল, 'স্যার, আমার প্রতি নাকি এখানে পক্ষপাতিত্ব করা হয়—মেল সাহেবের এই কথায় আমি প্রতিবাদ করছিলাম।'

'পক্ষপাতিত্ব?' ফ্যাসফেসে গলায় যতটা সম্ভব হংকার ছেড়ে ক্রিকল সাহেব বললেন, 'আমার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের বদনাম? আপনি কী বলতে চান মেল সাহেব?'

মেল সাহেব মাথা নিচু করে বললেন, 'আমি খুব উত্তেজিত হয়ে বলেছি, স্যার, ঠাণ্ডা মাথায় থাকলে ও-রকম কথা বলতাম না।'

মেল সাহেব বিনীত হলেও স্টিরফোর্ডের উত্তেজনা কিন্তু বেড়েই চলে, সে বলে, 'স্যার, আমাকে ইতর বলা হয়েছে, অভ্যন্তর বলা হয়েছে, তাই আমি রেগে গিয়ে তাঁকে ভিখেরি বলেছি।'

মেল সাহেব আমার পিঠে আন্তে আন্তে হাতের চাপ দিয়েই চলেছেন, তিনি যেন আমার কাছে আশ্রয় চাইছিলেন। ক্রিকল সাহেব বললেন, 'ভিখেরি? মেল সাহেব ভিক্ষে করেন কোথায়?'

'তিনি ভিক্ষে না—করলেও তাঁর নিকট আত্মীয় তো করেন, একই হলো।' বলতে বলতে স্টিরফোর্ড আমার দিকে তাকায়। মেল সাহেব তখনো আমার ঘাড়ে হাত রেখে আন্তে আন্তে চাপ দিচ্ছেন। লজ্জায়, অনুত্তাপে, আফসোসে আমি মাথা নিচু করে থাকি, আমি একদিন কথায় কথায় মেল সাহেবের মাঝের গাল করেছিলাম, তিনি যে দাতব্য আলয়ে বাস করেন সে কথাটিও বলা হয়ে গিয়েছিল। আমার চোখ নিচের দিকে, মেল সাহেব কিন্তু আমার ঘাড়ে আদর করে আন্তে আন্তে চাপ দিয়েই চলেছেন। এর মধ্যে স্টিরফোর্ড বলেই ফেলল, 'মেল সাহেবের মা দাতব্য আলয়ে অন্যের ঘৃণাতের ওপর বেঁচে থাকেন।' মেল সাহেব তখন ওই সুন্দর বালকটির মুখের দিকে তাকিয়ে রাইলেন। অনেক কষ্টে ক্রিকল সাহেব উত্তেজনা চেপে রেখে বললেন, 'আমার এই প্রতিষ্ঠানে তো এরকম লোককে থাকতে দেওয়া যায় না।' ক্রিকল সাহেবের কপালের রগ দপ্ত করে ফুলে উঠল, তিনি বললেন, 'আপনি কি এটা একটা দাতব্য ক্ষুল ভেবেছেন? আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে অব্যাহতি নিয়ে চলে গিয়ে আমাদের অপমান থেকে অব্যাহতি দিন।'

মেল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি। আর সময় নেই।'

তাঁর সমস্ত সম্বল যা ছিল, করেক্টি বই এবং তাঁর বাঁশিটি নিয়ে মেল সাহেব আমাদের ক্ষুল থেকে চলে গেলেন। ওই রাত্রেও স্টিরফোর্ডকে গাল শোনাতে আমি মেল সাহেবের বাঁশির বিষণ্ণ সুর শুনতে পাচ্ছিলাম। রাত অনেক হলে স্টিরফোর্ড ঘুমিয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম যে এখান থেকে অনেক দূরে, অন্য কোথাও বসে মেল সাহেব যেন বিষাদাচ্ছন্ন সুরে এক নাগাড়ে বাঁশি বাজিয়েই চলেছেন। আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম।

(সংক্ষেপিত)

লেখক-পরিচিতি

চার্লস ডিকেপের পুরো নাম চার্লস জন হাফ্যাম ডিকেল। তিনি উনিশ শতকের শতাব্দীর ইংরেজ উপন্যাসিক। তাঁর জন্ম ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথে। ডিকেপ তার জীবদ্ধায়ই পূর্বসূরি লেখকদের তুলনায় অনেক জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পরও সারা পৃথিবীতে তাঁর জনপ্রিয়তা অঙ্গুষ্ঠ আছে। চার্লস ডিকেপের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে ‘অলিভার টুইস্ট’, ‘অ্যাটেল অফ টু সিটিজ’, ‘ডেভিড কপারফিল্ড’, ‘হেট এক্সপ্রেশন্স’, ‘হার্ড টাইমস’ প্রভৃতি। গভীর জীবনানুভূতি, বাস্তবতাবোধ ও মানবিকতা তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

রূপান্তরকারী-পরিচিতি

আব্দতারজামান ইলিয়াস সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর জন্ম ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে গাইবান্ধা জেলায়। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ ও ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাস এবং ‘অন্যঘরে অন্যঘর’, ‘দুধভাতে উৎপাত’, ‘দোজখের ওম’ প্রভৃতি তাঁর ছোটোগল্প-এছু। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ দেশে-বিদেশে নানা গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ও একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পটি চার্লস ডিকেপের ‘ডেভিড কপারফিল্ড’ উপন্যাসের প্রথম অংশের ভাবান্বাদমূলক সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক বালকের জীবনের করুণ গল্প। মাত্র ছয় মাস বয়সে ডেভিড তার বাবাকে হারায়। ছোটোবেলা থেকেই ডেভিড ছিল অনুভূতি ও কল্পনাপ্রবণ। তার মাঝের নাম ছিল ক্লারা। বাবার মৃত্যুর পর মাঝের সঙ্গে ভালোই যাচ্ছিল ডেভিডের দিনগুলো, কিন্তু আটবছর বয়সে জীবনে নেমে এল নিপীড়ন। মা ক্লারা বিয়ে করলেন নিষ্ঠুর স্বভাবের ব্যক্তি মার্ডস্টোনকে। তার বোন মিস মার্ডস্টোনও বদমেজাজি। বিনা কারণে ডেভিডের উপর রুষ্ট ছিলেন তার সৎবাবা ও মিস মার্ডস্টোন। মা ও কাজের মেয়ে পেগোটিই ছিল ডেভিডের ভালোবাসার মানুষ। ডেভিডকে লন্ডনের এক আবাসিক কুলে ভর্তির জন্য পাঠানো হলো সেখানেও সে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়। তবে সেই জীবনে হৃদয়বান মানুষেরও দেখা গেল সে। তার ভালো লাগল নিরীহ ধরনের শিক্ষক মেল সাহেবকে। কিন্তু সে মেল সাহেবও টিকতে পারলেন না মানুষের মন্দ স্বভাবের জন্য।

ডেভিডের জীবন থেকে বোঝা যায়, ধৈর্য ও সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়েই মানুষকে টিকে থাকতে হয়।

শব্দাখ ও টীকা

জুলফি	— কানের পাশ দিয়ে গালের ওপর এলিয়ে গড়া চুল।
বরদাশত	— সহ্য।
‘রডারিক র্যানডম’	— টুবিয়াস স্মলেট রচিত রোমাঞ্চ-উপন্যাস।
‘টম জোনস’	— হেনরি ফিল্ডিংসের স্নেখা উপন্যাস।
‘দি ভিকার অফ	
ওয়েকফিল্ড’	— অলিভার গোল্ডস্মিথের বিখ্যাত উপন্যাস।
‘ডন কুইকসোট’	— স্পেনীয় লেখক সার্বেন্টেজের স্নেখা উপন্যাস।
‘বাবিলন ভুসো’	— ড্যানিয়েল ডিফোর স্নেখা উপন্যাস।
‘আরব্য রজনী’	— আরবীয় লোকগাথার বই।
বাজুখাই	— কর্কশ।
এ্যায়সা	— এমন।
মুহুর্মুহু	— একনাগাড়ে।
একাগাড়ি	— দুই চাকা বিশিষ্ট ঘোড়ার গাড়ি।
জনাকীর্ণ	— জনবহুল, বহুলোক আছে এমন।
সসপ্যান	— কড়াই। ইংরেজি Saucepan.
গোথাসে	— তাড়াভুড়া করে। গুরুর মতো একত্রে অধিকপরিমাণ খাদ্য গুরুত্বপূরণ।
ঠাণ্টা-বিদ্রূপ	— হাসি-তামাশা।
রিপোর্ট	— প্রতিবেদন, বিবরণ। এখানে অভিযোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
ঝক্কি	— ঝামেলা, বিপদ।
হঙ্কার	— গর্জন।
খয়রাত	— দান।
সম্বল	— অবলম্বন।
বিষাদাত্তন্ত্র	— বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেছে এমন।

ମୁକ୍ତି

ଅୟାଲେଞ୍ଚ ହାଲି

ଅନୁବାଦ : ଗୀତି ସେନ



সকালের খাবার দেবার পর দুজন সাদা মানুষ একবোৰা জামা-কাপড় হাতে ঘরে ঢুকল। ভীত বন্দিদের বাধন খুলে দিয়ে সেগুলো কী করে পরতে হয় দেখিয়ে দেওয়া হলো। একটা বন্ধে পা থেকে কোমর পর্যন্ত, অন্য একটায় উর্ধ্বাঙ্গ ঢাকতে হয়। কুন্টার ঘাগুলো সেরে এসেছিল। জামা-কাপড় পরামাত্মা সেগুলো চুলকাতে শুরু করল। বাইরে লোকজনের কথাবার্তার কোলাহল ত্রন্মে বাঢ়ছিল। ক্রমশই লোক জমাছিল। কুন্টারা জামাকাপড় পরে বিমৃঢ় হয়ে বসেছিল— কী জানি এর পরে কপালে কী আছে!

সাদা মানুষদুটো ফিরে এসে প্রথমে রাখা বন্দিদের মাঝে তিনজনকে বার করে নিয়ে গেল। তারপরেই বাইরের আওয়াজের ধরনটা বদলে গেল। কুন্টা অবাক হয়ে কতকগুলো অবোধ্য চিংকার শুনছিল।

‘নিয়ুত ষাণ্ঠি ! অফুরন্ত কর্মশক্তি !’

অন্য কোনো সাদা মানুষের গলা—

‘তিনশো পঞ্চাশ !’

‘চারশো !’

প্রথম সাদা মানুষটির চিত্কার শোনা গেল , ‘হয় ! কে হয় বলবেন ? তাকিয়ে দেখুন । দুর্দান্ত কর্মক্ষমতা !’

কুন্টা ভয়ে শিউরে উঠছিল । তার মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম বারছিল । নিঃশ্বাস রূক্ষ হয়ে আসছিল । যখন চারজন সাদা মানুষ ঘরে চুকল—সে যেন অসাড় ! কুন্টাকে স্পর্শ করতে সে রাগে ভয়ে দাঁত খিচিয়ে উঠল ।

তখনই মাথায় একটা প্রবল আঘাত পেয়ে তার বোধশক্তি লুণ্ঠ হয়ে গেল । সচেতন হয়ে উঠতে দেখতে পেল—উজ্জ্বল দিবালোকে আরো দুজনের সঙ্গে সেও বাইরে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে । চারদিকে শত শত সাদা মানুষ হা-করে তাকিয়ে আছে । তারই মাঝে দুটো কালো মানুষ শিকল হাতে দাঁড়িয়ে । যুথের ভাব দেখে মনে হয় , পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারা একান্ত উদাসীন । চোখের দ্রষ্টি সম্পূর্ণ নির্লিঙ্গ , লক্ষ্যহীন ।

‘সদ্য গাছ থেকে পেড়ে আনা !’

‘বাদরের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন !’

‘সবকিছু শিখিয়ে নেওয়া যাবে !’

সাদা মানুষটা পায়চারি করতে করতে হাত নেড়ে কুন্টার আপাদমস্তক নির্দেশ করে কথাগুলো চিত্কার করে বলছিল । তারপর কুন্টাকে জোর করে ঠেলে সামনে একটা বেদির মতো উচু জায়গায় ওঠাল ।

‘একেবারে সরেস ! নিজের ইচ্ছামতো গড়ে নেওয়া যাবে !’

কুন্টা ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে লক্ষণ করেনি কখন চারদিকের লোকজন এগিয়ে এসে তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করছে ।

‘তিনশো ডলার !’—‘তিনশো পঞ্চাশ !’

‘পাঁচশো !’ ‘হয় !’

সাদা মানুষটা ক্রুক্ষ গর্জনে বলে উঠল—‘বাজারের সেরা । তরুণ যুবা । কেউ কি সাড়ে সাত বলবেন ?’

একজন চেঁচিয়ে উঠল—

‘সাড়ে সাত !’

‘আট ! আট !’

ভাক উঠল—‘আট !’ আর কেউ কিছু বলে ওঠার আগেই আবার শোনা গেল—‘সাড়ে আট !’

ভাক আর চড়ল না ।

যে সাদা মানুষটা এদিক থেকে চেঁচাচ্ছিল , সে কুন্টার শিকল খুলে নিয়ে তাকে সামনে একজনের দিকে ঠেলে দিল । এই নতুন সাদা মানুষটার পেছনে একজন কালো লোক । শিকলের প্রান্তটা তারই হাতে দেওয়া ছিল । তার প্রতি কুন্টার অনুনয়পূর্ণ চাহানি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো । সে লক্ষ্যহীন নির্বিকার দৃষ্টিতে কুন্টাকে শিকলসুন্দ টেনে একটা চার চাকার বাঞ্ছের সামনে নিয়ে এল । বাঞ্ছাটার সামনে একটা বিরাট গাধাজাতীয় পশু । কালো লোকটা কুন্টার কানেক্ষণে কুন্টাকে বাঞ্ছের মেঝেতে ঠেলে ফেলে দিয়ে শিকলটা কোথায় আটকে দিল । কিছুক্ষণ পরে কুন্টা গঙ্গে অনুভব করল— সাদা মানুষটা ফিরে এসেছে । সে গাড়ির ওপরে চড়ে বসতে , কালো লোকটি ও সামনের সিটের মাথায় উঠে বসে একটা চামড়ার ফিতে পশ্টোর পিঠে আছড়ে ফেলল । তামনি বাঞ্ছাটা গড়িয়ে চলতে শুরু করল ।

কুন্টা শিকলটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। বড়ো ক্যানুতে তাদের যে শিকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, তার থেকে এটা হালকা ধরনের। প্রাণপথে চেষ্টা করলে কি হেঁড়া যাবে না? কিন্তু এখন গাড়ি থেকে লাফাবার উপরুক্ত সময় নয়।

কুন্টা একবার মাথা তুলে সাদা মানুষটার দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে সেও পেছন ফিরে তাকাতে তাদের চোখাচোধি হয়ে গেল। তায়ে কুন্টার দেহ হিম। কিন্তু সাদা মানুষটার মুখে ভাবের লেশমাত্র ছিল না।

পথের ধারে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। বিভিন্ন রঙের শস্য দেখা যাচ্ছে। তার মাঝে ভূট্টা সে চিনতে পারল। জুড়েরেতে ফসল কাটবার সময় যেমন দেখতে হয়, তেমনি। খানিকক্ষণ পর সাদা মানুষ এবং কালোটি দুজনেই শুকনো রুটি আর মাংস বের করে ছিড়ে ছিড়ে থেতে লাগল। কুন্টার খুবই খিদে পেয়েছিল। খাদ্যের সুগন্ধে তার জিভে জল এসে গেল। তবুও সামনের কালো লোকটি যখন পেছন ফিরে তাকে এক টুকরো রুটি দিতে চাইল, সে তার মুখ ফিরিয়ে নিল।

সূর্য অন্ত যাচ্ছিল। তাদের গাড়ির পাশ দিয়ে আর একটি গাড়ি বিগরীত দিকে ছুটে গেল। গাড়িটির পেছনে চরম ক্লান্তিভরে দ্রুত পদক্ষেপে চলছিল মোটা কাপড়ের পুরোনো হেঁড়া পোশাক-পরা সাতটি কালো মানুষ। তাদের মুখে গভীর হতাশার ছাপ। ক্রমে অঙ্ককার ঘনিয়ে আসতে কুন্টাদের গাড়িটা পাশের ছাটো রাঙায় ঢুকে পড়ল। দূরে গাছের ফাঁকে একটা বিরাট সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। এবার কী হবে? এখানেই কি তাকে হত্যা করে খাওয়া হবে?

বাড়িটার কাছে এসে কুন্টা আরো কালো মানুষের গন্ধ পেল। অঙ্ককারের ভেতর তিনটি মানুষের আকার বোঝা যাচ্ছিল। একজনের হাতে আলো বোলানো। বড়ো ক্যানুর অঙ্ককার খোলের ভেতর এ ধরনের আলো কুন্টা দেখেছে। কেবল এটার চারপাশে একটা স্বচ্ছ চকচকে আবরণ, তার ভেতর দিয়ে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। কালো লোকগুলোর পাশ দিয়ে একটা সাদা মানুষ এগিয়ে এল। গাড়িটা থেমে যেতে একজন আলোটা উঁচু করে ধরল। ভেতরের সাদা মানুষটা নেমে এসে নতুন লোকটার সঙ্গে করমর্দন করল। তারপর দুজনে হাসিমুখে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কুন্টার মনে একটু আশা হলো। এবার কালো লোকেরা তাকে হেঁড়ে দেবে না? কিন্তু এ কেমন কালো লোক? তারা তাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসছে! নিজের স্বজাতির লোক নিয়ে এরা পরিহাস করছে? ছাগলের মতো সাদা মানুষের হৃকুমে কাজ করে? এদের আধ্বিকাবাসীর মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু এরা কখনো তা হতে পারে না।

গাড়িটা কুন্টাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। অন্য কালো লোকগুলো হাসাহাসি করতে করতে পাশে পাশে চলল। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা থামতে, চালক নেমে এসে শিকলের অপর প্রান্ত খুলে বৃং ভঙিতে টান মেরে কুন্টাকে নামতে ইঙিত করল।

লোকগুলো জোর করে তাকে নামাল। তারপর একটা খুঁটির সঙ্গে শিকলটা আবার বেঁধে দিল। কুন্টা দৈহিক যত্নগা, আস, ত্রেণ ও ঘৃণাতে কাতর হয়ে সেখানে পড়ে থাকল। একজন তার সামনে এক পাত্র জল ও এক পাত্র খাদ্য নামিয়ে রাখল। খাদ্যটা যেমন অঙ্কুত দেখতে, তেমনি অঙ্কুত তার গন্ধ। তবুও তা দেখেই কুন্টার রসনা

লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু কুন্টা মুখ ফিরিয়েই থাকল। কালো লোকগুলো তা দেখে আবারও বিদ্রূপের হাসি হাসল। গাড়ির চালক আলোটা তুলে ধরে মোটা ঝুটির কাছে গিয়ে শিকলটা জোরে টেনে কুন্টাকে দেখিয়ে দিল—পটা ছেঁড়া যাবে না। তারপর খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে শাসানির ভঙ্গি করল। সবাই হাসতে হাসতে চলে গেল।

কুন্টা অপেক্ষা করতে লাগল—কখন সবাই ঘুমোবে, কখন সে পালাবার সুযোগ পাবে। এরই মধ্যে একটা কুকুর এসে তার খাবারের পাত্র খালি করে দিয়ে গেল। রোধে কুন্টার সর্বাঙ্গ জুলে গেল। সে খানিকটা জলপান করে নিল। কিন্তু তাতে শারীরিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হলো না।

পালাবার অদম্য ইচ্ছা অতি কষ্টে দমন করে সারারাত সে জেগে কাটাল। সে জানে শিকল ভাঙবার চেষ্টা করলেই বানঘনানির শব্দে পাশের কুটিরের লোক ছুটে আসবে। ইতোমধ্যেই কুকুরের ভাকে গাড়ির চালকটি একবার বেরিয়ে এসে শিকল পরীক্ষা করে গিয়েছে।

পুরের আকাশ ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছিল। কুন্টা আর একটু জল পান করল। এমন সময় সেই কালো লোক চারটে দ্রুত পায়ে এসে কুন্টাকে টেনে তুলে আবার সেই গড়ানো বাজ্জের মতো গাড়িটাতে ঢেঢ়ে বসল। তারপর গাড়ি বড় রাঙ্গা দিয়ে আগের দিনের মতই চলল। কুন্টার দুই চঙ্কু অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণায় সামনের মানুষগুলোর পিঠের ওপর অশ্বিবর্ণ করতে থাকল। যদি এদের খুন করা যেত! কিন্তু বুদ্ধি ছির রাখতে হবে। মাথা গরম করলে চলবে না। অথবা শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই।

কিছু দূর গিয়ে ঘন বন দেখা গেল। কতক জায়গায় গাছ কেটে জঙ্গল সাফ করা হয়েছে। আবার কিছু জায়গায় জঙ্গল পোড়ানো হচ্ছে। ধূসুর বর্ণ ধোঁয়ার রাশি উঠছিল। সাদা মানুষরাও কি জুফরের মতো গাছপালা পুড়িয়ে জনির ফলন শক্তি বৃদ্ধি করে?

আরো খানিকটা দূরে কাঠের তৈরি একটি ছোট্ট চৌকো কুটির, আর তার সামনে পরিষ্কার একখণ্ড জমি। একটা ঘাঁড়ের পেছনে বাঁকানো হাতলওয়ালা কী একটা মন্ত জিনিস। একজন সাদা মানুষ হাতল দুটো চেপে ধরেছে। তাতে পেছনের মাটি বিদীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। আরো দুটো রোগামতল সাদা মানুষ গাছের নিচে উৰু হয়ে আছে। তিনটে রোগা-পটকা শয়োর আর কিছু মুরগি চারপাশে ছুটোছুটি করছে। কুটিরের দরজায় একটি লাল চুলের সাদা মেরে মানুষ। তিনটে সাদা বাচ্চা খেলে বেড়াচ্ছিল। তারা গাড়িতে কুন্টাকে দেখে হাত নেড়ে চেঁচাতে লাগল। কুন্টার ভাব দেখে মনে হলো সে হায়েনা শিশু দেখছে! এতদিনে সে সত্যি একটি সাদা মানুষের পুরো পরিবার দেখতে পেল। পথে যেতে যেতে আগেকার মতো আরো দুটি মন্ত সাদা বাড়ি দেখা গেল। প্রত্যেকটির ওপর দিকে একটা ওপর আর একটা চাপানো—দুটো বাড়ির সমান। প্রত্যেকটিরই কাছাকাছি বেশ কিছু ছোটো ছোটো অঙ্ককার কুটির। কুন্টা আন্দাজ করল—সেগুলোতেই কালো লোকেদের বাস। আর চারপাশ ঘিরে বিঞ্চীর তুলোর খেত। অল্পদিন আগে ফসল তোলা হয়েছে। তখনও গোছা-গোছা তুলো চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো।

পথে কুটা আৰ একটি অঙ্গুত জিনিসেৱ দেখা পেল। রাষ্ট্ৰ ধাৰ দিয়ে দুজন বিচ্ছিন্ন লোক যাচ্ছিল। প্ৰথমে সে ভেবেছিল—তাৰা বুবি কালো। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল তাৰেৱ গায়েৰ ৱং কেমন লালচে বাদামি। দীৰ্ঘ কালো চূল দড়িৰ মতো পাকানো হয়ে গেছনে বুলছে। হালকা জুতো পায়ে, কোমৰে সন্তুষ্ট চামড়াৰ তৈরি এক ধৰনেৰ আচ্ছাদন বুলিয়ে লোক দুটো দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। সঙ্গে তিৰ-ধনুক। তাৰা সাদা মানুৰ নয়। আবাৰ আফ্ৰিকাৰাসীও নয়। তাৰেৱ গায়েৰ গঞ্জই আলাদা। গাড়ি দেখে তাৰা জৰুৰিপও কৱল না।

পুৱো দুদিন উপবাসেৰ পৰ কুটাৰ দুৰ্বল লাগছিল। চাৰিদিকে কী ঘটছে সে বিষয়ে তাৰ আৰ উৎসাহ ছিল না। কিছু সময় পৱে গাড়িৰ চালক বাক্সেৰ পাশে একটা আলো বুলিয়ে দিল। আবাৰ খানিকটা পৰ সাদা মানুষটা কী যেন বলাতে গাড়িৰ চালক কুন্টাৰ দিকে একটা চাদৰ ছুঁড়ে দিল। নিজেৱাও গায়ে চাদৰৰ জড়িয়ে নিল। কুন্টা শীতে কাঁপছিল। কিন্তু ওদেৱ দেওয়া চাদৰ সে কিছুতেই ব্যবহাৰ কৰবে না। তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে আবাৰ গায়েৰ চাদৰ দেবাৰ বদান্যতা কেন? কালো লোকটাকেও বলিহারি! সে-ই অঁগলী হয়ে সাদা মানুষটাকে এসব কাজে সাহায্য কৰছে! কুন্টাকে পালাতেই হবে। না-হয় সে চেষ্টাতে তাৰ প্ৰাণটাই যাবে। জীবনে আৰ কখনো জুফৱে দেখবাৰ সৌভাগ্য হবে না। যদি হয়, তবে সে গাষ্মিয়াৰ ঘৱে ঘৱে সাদা মানুষেৰ এই অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুৱতাৰ কাহিনি বলবে।

গাড়িটা বড়ো রাষ্ট্ৰ থেকে এবাৰ একটা ছোটো রাষ্ট্ৰয় ঢুকল। দূৰে আৰ একখানা ভূতুড়ে সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আজ রাত্ৰে আবাৰ কপালে কী আছে কে জানে। কুন্টা বাড়িৰ সামনে পৌছেও সাদা বা কালো মানুষেৰ কোনো চিহ্ন বা গঞ্জ পেল না। সাদা মানুষটা গাড়ি থেকে নেমে কয়েকবাৰ আড়মোড়া ভেঁড়ে শৰীৱেৰ আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিল। তাৰপৰ সে বাড়িৰ ভেতৰ চুকে গেল। গাড়িটা আৱো খানিকটা এগিয়ে একটা কুটিৱেৰ সামনে দাঁড়াল। গাড়িৰ চালক কোনোক্ষমে নিজেকে ওপৰ থেকে নামিয়ে নিল। বাতিটা হাতে নিয়ে অতি কষ্টে পা টেনে টেনে ঘৱেৱ দিকে ঝওয়ানা দিয়ে কী যেন ভেবে ফিরে এল। গাড়িৰ সিটেৰ নিচে হাত বাড়িয়ে শিকলটা খুলে নিয়ে সে আবাৰ যাবাৰ উগক্ৰম কৱল। কুন্টা সঙ্গে আসবে না দেখে শিকল ধৰে হ্যাচকা টান মেৰে তাৰ উদ্দেশ্যে ত্ৰুটি হৱে কিছু বলে উঠল। মুহূৰ্তে কুন্টা তাৰ ওপৰ বাঁপিয়ে পড়ল। প্ৰচণ্ড পৱাক্ৰমে হায়নাৰ শক্তিশালী চোয়ালোৰ মতো কঠিন হাতে তাৰ কঠিনশি টিপে ধৰল। বাতিটা মাটিতে পড়ে গেল। কালো লোকটাৰ গলা দিয়ে একটা অৰুণক আওয়াজ বেৱোল। সে তাৰ বলিষ্ঠ দুই হাতে কুন্টাৰ মুখে ও বাহুতে যথাসাধ্য আক্ৰমণ চালাল। কিন্তু কুন্টাৰ গায়ে তখন অ্যুত হাতিৰ বল। সে নিজেৰ শৱীৰ বাঁকিয়ে শক্র ঘূৰি, হাঁটুৰ ঘুঁতো, পায়েৰ লাখি এড়াবাৰ চেষ্টা কৰছিল। কিন্তু হাতেৰ চাপ শিথিল হতে দেয়ানি। অবশেষে লোকটাৰ গলায় একটা ঘৱঘৱ শব্দ হতে থাকল। তাৰ শক্তিহীন নিঃসাড় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কুন্টা ভূলুষ্ঠিত দেহ আৱ উলটে-পড়া বাতিৰ কাছ থেকে দ্রুতবেগে সৱে গেল। খেতেৰ অসমান কৰ্কশ জমিৰ ওপৰ দিয়ে সে নিচু হয়ে দৌড়াতে লাগল। এতদিনেৰ অ্যুবহাৱে শৱীৰেৰ পেশিগুলো যন্ত্ৰণায় প্ৰচণ্ড আৰ্তনাদ কৰছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়াতে তাৰ আৱাম বোধ হচ্ছিল। আৱ মুক্তিৰ আনন্দে সৰ্বদেহ মন আতশবাজিৰ মতো ফেটে পড়তে চাইছিল।



লেখক-পরিচিতি

আলেক্স হ্যালি একজন আফ্রিকান বংশোদ্ধৃত আমেরিকান লেখক। তিনি জন্মেছেন ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। 'Roots' বইটির জন্যই মূলত তাঁর বিশ্বজুড়ে খ্যাতি। এই উপন্যাসের গল্প নিয়েই পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিজ। হ্যালি মারা যান ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে।

অনুবাদক-পরিচিতি

গীতি সেনের জন্ম কুমিল্লায়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশভাগের পর সপরিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। 'শেকড়ের সন্ধানে' তাঁর উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্ম।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পটি আলেক্স হ্যালির 'Roots' উপন্যাসের অংশবিশেষের অনুবাদ। গল্পাংশে আফ্রিকার গান্ধিয়া নামক দেশের একটি গ্রাম জুফরে। কুন্টা সেই আমের অধিবাসী। কালো এই মানুষটিকে ধরে নিয়ে এসেছে সাদা আমেরিকানরা। দাস হিসেবে তাকে বিক্রি করা হবে। গোশাক পরিয়ে পরিপাটি করে দাস বাজারে তাকে বিক্রি করা হলো সাড়ে আটশ ডলারে। কুন্টা তরুণ, যুবক। বাজারে তার মূল্য বেশি। কেননা তাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেয়া যাবে। ভালো দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেল এক সাদা লোক। কুন্টার সঙ্গে তারা খুব দুর্ব্যবহার করল, অগমান করল। সে দেখতে পেল তার মতোই অনেক কালো আছে দাসবাজারে কিংবা সাদা মানুষদের বাড়িতে। সাদাদের জন্য কাজ করছে। কুন্টার মনের ভেতর শুধু পালাবার ইচ্ছা। সুরোগের অপেক্ষায় থাকল সে। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সাদা লোকদের কোনো এক বাড়িতে। রাঙ্গিবেলা পৌছল সেই বাড়ি। সাদা লোকটি যখন গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল তখন সে বাঁপিয়ে গড়ুল গাড়িচালকের গুপ্ত। প্রচণ্ড আক্রমণে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আঘাত করল তাকে। লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পালিয়ে গেলো কুন্টা। তার শরীর ও মনে তখন মুক্তির থ্রেল আনন্দ। আফ্রিকার ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল যখন সাদারা কালোদের বন্দি করে বিভিন্ন দেশের দাস-বাজারে বিক্রি করত। 'মুক্তি' গল্পটিতে দাসব্যবসার একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে তরুণ কুন্টা তার বুদ্ধি, সাহস ও শক্তি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

গল্পটিতে জাতিগত ও বর্ণগত নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবার তীব্র বাসনারই প্রকাশ ঘটেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

উর্ধ্বাঙ্গ	— শরীরের ওপরের অংশ।
বিমৃঢ়	— হতবুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞানশূল্য।
কুন্দ	— বজ্জ।
দিবালোক	— দিনের আলো।
পারিপার্শ্বিক অবস্থা	— চারপাশের অবস্থা।
নির্লিঙ্গ	— কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ নেই এমন।
আগাদমস্তক	— গা থেকে মাথা পর্যন্ত।
সরেস	— খাটি।

ଅନୁଶୟ	— ଅନୁରୋଧ ।
କ୍ୟାନୁ	— ନୌକା-ଜାତୀୟ ଜଳଧାନ । ଇଂରେଜି Canoe.
ଶାସାନୋ	— ଭୟ ଦେଖାନୋ ।
ରୋବ	— ଫୋଭ ।
ପ୍ରତ୍ୟୁଷ	— ଭୋର ।
ଆନ୍ଦାଜ	— ଅନୁମାନ ।
ବିଚିତ୍ରଦର୍ଶନ	— ଦେଖିଲେ ଉଚ୍ଛିଟ ।
ଆଚ୍ଛାଦନ	— ଆବରଣ ।
ଜୁଫ୍ଫେଗ	— ତାକାନୋ ବା ଲଞ୍ଛ କରା ।
ଉପବାସ	— ନା-ଖେଯେ ଥାକା ।
ବଦାନ୍ୟତା	— ଉଦାର, ଦରଦି ଭାବ ।
ବଞ୍ଚିହାରି	— ଚମଞ୍ଚକାର ।
ଅହଣୀ	— ଗ୍ରଧାନ ନେତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ । ଏଥାନେ 'ଆଗ ବାଡ଼ିରେ' ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରା ହେବେ ।
ଆଡ଼ମୋଡ଼ା	— ଆଲସ୍ୟ ଭାବ ।
ଆଡ଼ିଷ୍ଟତା	— ଜଡ଼ତା ।
ପରାକ୍ରମ	— ବଲ, ବୀରତ୍ଵ ।
ଭୂଲୁଷ୍ଟିତ	— ମାଟିତେ ପଡ଼େ ଯାଓଯା ।

ফিলিস্তিনের চিঠি

ঘাসান কানাফানি

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রিয় মুস্তাফা

এক্সুনি তোর চিঠি গেলাম। তাতে তুই আমায় লিখেছিস যে, তোর ওখানে থাকবার জন্য যা যা করা জরুরি হিল, সব তুই করে ফেলেছিস। আমি এই খবরও পেয়েছি যে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইনজিনিয়ারিং বিভাগে আমাকে নেওয়া হয়েছে। তুই আমার জন্যে যা করেছিস, দোষ্ট, সবকিছুর জন্যে তোকে ধন্যবাদ, শুকরিয়া। তবে এটা নিশ্চয়ই তোর কাছে একটু অস্তুত ঠেকবে যখন আমি এ খবরটা দেবো—না দোষ্ট, আমি আমার মত পালটেছি। আমি তোকে অনুসরণ করে সেই দেশে যাব না, যে দেশ 'শ্যামল, সঙ্গল আর সুগ্রী সুন্দর সব মুখে ভরা'—যেমন তুই লিখেছিস। না, আমি এখানেই থাকব। কোনোদিন এদেশ ছেড়ে যাব না।

আমি কিন্তু সত্যি বড় অবস্থিতে আছি, মুস্তাফা। আমাদের জীবন আর কখনোই এক খাতে বয়ে যাবে না। অবস্থার কারণ, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি তুই আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছিস—কী রে, আমরা না কথা দিয়েছিলাম সব সময় একসঙ্গে থাকব, যেমন আমরা চিরকাল একসঙ্গে বলে উঠতাম, 'আমরা বড়োলোক হবোই! আমাদের অনেক টাকা হবে!' কিন্তু দোষ্ট, কিছুই আর আমার করার নেই। হ্যাঁ, আমার এখনও সেদিনটা মনে পড়ে যেদিন কায়রোর বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে আমি তোর হাত চেপে ধরেছিলাম।

তুই বলছিল, 'উড়েজাহাজ ছাড়বার আগে আরো পনেরো মিনিট সময় আছে হাতে। অমনভাবে হা করে আকাশে তাকিয়ে থাকিস না। শোন। পরের বছর তুই কুয়েত যাবি। মাইনে যা পাবি তা থেকে যথেষ্ট টাকা বাঁচাতে পারবি। ফিলিপ্পিনের মাটি থেকে শেকড় ওগড়াতে তাই যথেষ্ট। তারপর ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে নতুন করে শেকড় পুঁতবি। আমরা একসঙ্গে সব শুরু করেছি, আর একসঙ্গেই চালিয়ে যেতে হবে আমাদের...'

সেই মুহূর্তে আমি তোর ঠোটের দ্রুত নড়াচড়া দেখছিলাম, মুস্তাফা। তোর কথা বলবার ধরনটাই ছিল ভরকম, দাঁড়ি-কমা বাদ দিয়ে হড়বড় করে তোড়ে বলে চলা। কিন্তু আবহাভাবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল তোর এই পালানোতে তুই পুরোপুরি সুখী না। পালাবার তিনটে ভালো কারণ তুই দেখাতে পারিসনি। আমিও সর্বক্ষণ এই আক্ষেপে ভুগেছি। কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট চিন্তা ছিল—এই গাজাকে ছেড়ে সবাই মিলে পালিয়ে যাই না কেন আমারা? কেন যাই না? কেন পারি না? তোর অবস্থা অবশ্য ভালো হতে শুরু করেছিল। কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তোকে কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল, যদিও আমাকে দেয়ানি। যে দুরবস্থার দাবনার মধ্যে আমি গড়াগড়ি যাচ্ছিলাম, সেটা যেন আর পালটাবেই না। তুই মাঝে মাঝে আমাকে কিছু টাকা পাঠাতিস। তুই চেয়েছিলি আমি যেন ঝণ হিসেবেই তা গ্রহণ করি, কারণ তোর ভয় ছিল নয়তো আমি অপমানিত বোধ করব। আমার বাড়ির হালচাল তো তুই জানতিস। তুই জানতিস, স্কুলের চাকরিতে আমি যে সামান্য মাইনে পেতাম, তাতে আমার আম্বা, আমার ভাবি, আর তার ছেলেমেয়েসহ সংসারটা চালানোই অসম্ভব ছিল।

পরে কুয়েতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকেও কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল। আমি তোকে সবকিছু জানিয়েই চিঠি লিখতাম। সেখানে আমার বেঁচে থাকাটা ছিল কেমন একটা চটচটে ফাঁকা দমবক্স দশা। আমার গোটা জীবনটাই কেমন যেন পিছিল হয়ে গেছে, মাসের গোড়া থেকেই পরের মাস পয়লার জন্যে একটা উৎ বাসনা আমায় কুরে কুরে ধোয়। সেই বছরটার মাঝামাঝি, ফিলিপ্পিনে বোমা হামলা হয়। ঘটনাটা আমার কৃটিন খানিকটা পালটে দিয়ে থাকবে—তবে সেদিকে নজর দেবার খুব একটা ফুরসত বা উপায় আমার ছিল না। এই ফিলিপ্পিন পেছনে ফেলে রেখে আমি চলে যাব ক্যালিফোর্নিয়া, নিজেকে নিয়ে নিজে বাঁচব, আমার এই হতভাগা বেচারি জীবন কত ভুগেছে, কত সয়েছে!

আম্বা, ভাবি আর তার বাচ্চাদের জন্যে সামান্য টাকা পাঠাতাম আমি, যাতে তারা কোনোক্ষেত্রে টিকে থাকতে পারে। তবে এই শেষ বস্তনটাও আমি ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে মুক্ত করে ফেলব—সবুজ ক্যালিফোর্নিয়ায়। এই হার, এই পরাজয়ের পচা গুঁজ থেকে বাঁচাৰ নিজেকে। যে সহানুভূতি, যে সমব্যথা আমাকে আমার ভাইজানের বাচ্চা-কাচ্চাদের সঙ্গে আস্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল, তাদের আম্বা আর আমারও আম্বা—এরা কেউই কোনোকালে এই খাড়াই থেকে আমার উড়াল ঝাঁপকে কোনো মানে দিতে পারবে না। অনেক দিন কেটেছে—আর এই পিছুটান টানাহেঁচড়া চলবে না। আমাকে পালাতে হবে। এসব অনুভূতি তোর চেনা, মুস্তাফা, কারণ তোরও তো সত্যি এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

যখন আমি জুন মাসে ছুটিতে গেলাম। আমার যাবতীয় পার্থির সম্পত্তি জড়ে করলাম এক জায়গায়। মধুর পলায়নের জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠলাম। কিন্তু কী সেই অস্পষ্ট আবছায়া যা কোনো লোককে তার পরিবারের কাছে টেনে নিয়ে আসে? মুস্তাফা, আমি জানি না। আমি শুধু জানি—আমি আমার কাছে গিয়েছি, আমাদের বাড়িতে সেদিন সকালবেলায়। আমি যখন গিয়ে পৌছেছি, আমার ভাবি, আমার মরহুম ভাইজানের স্ত্রী, আমার সঙ্গে দেখা করল। আর ফুঁপিয়ে বলল, তার মেয়ে নাদিয়া জখম হয়ে গাজার হাসপাতালে আছে, আমাকে দেখতে চায়। আমি কি তাকে দেখতে যাব সেদিন সন্ধ্যাবেলা? তোর মনে আছে নাদিয়াকে, তোর বছর বয়েস, আমার ভাইয়ের মেয়ে?

সেদিন সন্ধ্যেয় আমি এক পাউন্ড আপেল কিনে নিয়ে নাদিয়াকে দেখতে হাসপাতালের উদ্দেশে বেরিয়ে গড়লাম। আমি জানতাম কিছু একটা রহস্য আছে। আমার আমা আর আমার ভাবি আমার কাছে যা চেপে গিয়েছে, এমন একটা কিছু যা তারা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। নাদিয়াকে আমি ভালোবাসতাম নিষ্ঠক অভ্যাসবশেষ, সেই একই অভ্যাস যা আমাকে ভালোবাসিয়েছে তাদের প্রজন্মের সবাকিছুকে। সেই যে এজন্য বড়ো হয়ে উঠেছে পরাজয়, হতাশায় আর বাস্তুহীনতায়।

কী ঘটেছিল সেই মুহূর্তে? আমি জানি না মুস্তাফা। খুব শান্তভাবেই আমি ঢুকেছিলাম ধ্বনিবে সাদা ঘরটায়। নাদিয়া শুয়ে আছে তার বিছানায় একটা মন্ত বালিশে পিঠ দিয়ে, যার ওপর তার চুল কালো এক ঘন পশ্চলার মতো ছড়িয়ে আছে। তার ডাগর চোখ দুটোর কী রকম একটা হমছমে গভীর স্তরতা। তার কালো চোখের তারায় টলমল করছে পানি। তার মুখখানি শান্ত নিষ্ঠল। এখনো বড় ছেলেমানুষ আছে নাদিয়া, কিন্তু তাকে দেখাচ্ছে কোনো বাচ্চার চেয়েও বেশি, আরো বেশি, কোনো বাচ্চার চেয়ে বড়ো, অনেক বড়ো।

‘নাদিয়া!’

সে তার চোখ তুলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তার ক্ষীণ, মৃদু হাসির সঙ্গে আমি তার গলা শুনতে পেলাম।

‘চাচা! তুমি কি এক্সুনি কুরেত থেকে এলে?’

তার কর্তৃত্বের কী রকম যেন তেঙে গেল তার গলায়। দুই হাতে ভর দিয়ে কোনোমতে সে উঠে বসল। গলাটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি হালকাভাবে তার পিঠ চাপড়ে তার পাশে বসে গড়লাম।

‘নাদিয়া! আমি তোর জন্যে কুরেত থেকে উপহার নিয়ে এসেছি, অনেক উপহার। বিছানা ছেড়ে উঠবি যখন, একেবারে সেরে যেতে হবে কিন্তু, ততদিন আমি সবুর করব। তারপর তুই আমার বাড়ি আসবি আর এক এক করে সব আমি তোকে দেব। তুই যে লাল সালোয়ারগুলো আনতে লিখেছিলি সেগুলো এনেছি। একটা নয়—অনেক।’ মিথ্যে কথা। আমি এমনভাবে কথাগুলো বললাম যেন জীবনে এই প্রথম আমি কোনো পরম সত্য কথা বলছি। নাদিয়া কেঁপে উঠল, ভয়ংকর এক স্তুতার মধ্যে সে তার মাথা নোয়াল। আমি টের পেলাম, তার চোখের জল আমার হাতের পিঠ ভিজিয়ে দিচ্ছে।

‘কিছু বল, নাদিয়া! লাল সালোয়ারগুলো তোর চাই না?’

সে তার ডাগর চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকাল। কিছু একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থতমত খেয়ে থেমে গেল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল। আমি তার গলা ওলতে পেলাম আবার। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। ‘চাচা!’

সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। আঙুল দিয়ে তুলে ধরল গায়ের সাদা চাদর। আঙুল তুলে দেখাল তার পা, উকুর কাছ থেকে কেটে বাদ দেওয়া।

দোষ্ট, মুন্তাফা... আমি কোনোদিন নাদিয়ার পা দুটো ভুলব না—উকুর কাছ থেকে কাটা। না! হাসপাতাল থেকে সেদিন আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম। হাতের মধ্যে মুঠো করা দুটি পাউন্ড, নাদিয়াকে দেব বলে এনেছিলাম। জুলজুলে সূর্য রাঙ্গা ভরিয়ে দিয়েছে টকটকে রঙের রঙে। এই ফিলিস্তিনে সবকিছু দপদপ করছে বিশাদে, মনস্তাপে, যা শুধুই কোনো রোদনের মধ্যে আবক্ষ নয়। যুদ্ধের আহ্বান এই বিশাদ। তারও বেশি, এ যেন কাটা পা ফিরে পাবার জন্যে একটা প্রচণ্ড দাবি!

গাজার রাঙ্গায় রাঙ্গায় আমি হেঁটে বেড়ালাম। চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরা সব রাঙ্গা। ওরা আমাকে বলেছে— নাদিয়া তার পা হারিয়েছে, যখন সে বাঁপিয়ে পড়েছিল তার ছোটো ছোটো ভাইবোনদের ওপর, তাদের ঢেকে দিয়েছিল নিজের ছোট শরীরটা দিয়ে। বোমা আর আগুন থেকে তাদের বাঁচাতে, যে-আগুনের হিস্স থাবা তখন বাড়িটায় পড়েছিল। নাদিয়া নিজেকে বাঁচাতে পারত, সহজেই সে ছুটে পালিয়ে যেত পারত লম্বা লম্বা পা ফেলে, রক্ষা করতে পারত তার পা। কিন্তু সে তা করেনি।

কেন?

না, মুন্তাফা, দোষ্ট আমার, আমি ক্যালিফোর্নিয়া যাব না—আর তাতে আমার কোনো খেদ নেই। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে আমরা যা শুরু করেছিলাম, তাও আমরা শেষ করব না। সেই আবছা মতো অনুভূতি যা তুই গাজা ছেড়ে যাবার সময় অনুভব করেছিলি, সেই ছোট বোধটাকে বিশাল হয়ে গড়ে উঠতে দিতে হবে তোর ভেতর। ছড়িয়ে পড়তে দিতে হবে তাকে, নিজেকে ফিরে পাবার জন্যে হাতড়াতে হবে তোকে, তন্মত্ব করে তোকে নিজেকে খুজতে হবে পরাজয়ের এই ধৰ্মসম্ভূপে।

আমি তোর কাছে যাব না মুন্তাফা। বরং তুই, তুই আমাদের কাছে ফিরে আয়। ফিরে আয়, মুন্তাফা, নাদিয়ার কাটা পা দুটি থেকে শিখতে, ফিরে আয় জানতে কাকে বলে জীবন, অঞ্চলের মৃণ্য কী আর কর্তৃ!

ফিরে আয়, মুন্তাফা, দোষ্ট আমার, ফিরে আয়! আমরা সবাই তোর জন্যে অধীর অপেক্ষা করে আছি।

লেখক-পরিচিতি

ঘাসান কানাফানি প্রখ্যাত ফিলিস্তিনি কথাসাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, আক্রান্ত। লেখাপড়া শেষ করে তিনি প্রথমে সিরিয়ার রাজধানী এবং পরে কুয়েতে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘আল-হাদাফ’ নামের সাংগ্রাহিক পত্র। যা ছিল ‘পঞ্চালার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন’-এর মুখ্যগত। তিনি উপন্যাস ছাড়াও লিখেছেন ছোটোগল্প, নাটক, প্রবন্ধ। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে ইসরায়েলি বাহিনির গোপন বোমা হামলায় তিনি নিহত হন।

অনুবাদক-পরিচিতি

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কবি, অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর জন্ম ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটে। লাতিন আমেরিকান সাহিত্য অনুবাদের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর অনুবাদে প্রকাশিত হয়েছে হ্যান কুলফো, গ্যালিফেল গারসিয়া মার্কেজ প্রয়োখের গল্প-উপন্যাস। অনুবাদ সাহিত্যের জন্য তিনি ভারতের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

এটি পত্রের ভাষায় রচিত একটি অনুবাদমূলক গল্প। এতে ইসরায়েলের আক্রমণে বিপর্যস্ত ফিলিস্টিনের মর্মান্তিক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধু মুস্তাফাকে সম্মোহন করে লেখা এই চিঠিতে দেখা যায়, যুদ্ধবিধিত ফিলিস্টিন ছেড়ে সুন্দর ও সুখী জীবনের প্রত্যাশায় মুস্তাফা প্রথমে কুয়েত ও পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে যায়। চিঠির লেখককেও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমন্ত্রণ জানায় মুস্তাফা। অনেক দিন-ঘন্টের পর বিপর্যস্ত ফিলিস্টিন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন পত্রলেখক। কিন্তু কর্ম এক অভিজ্ঞতা তাকে আমুল বদলে দেয়। সে ফিলিস্টিন ছাড়ার পূর্বে নিজের মা-ভাবির সঙ্গে দেখা করতে এসে জানতে পারে, তার নিহত ভাইয়ের মেয়ে নাদিয়া বোমার আক্রমণে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লেখক তাকে দেখতে যায়। নাদিয়ার মনকে প্রকল্প করার জন্য বলে, তার চাওয়া অনেকগুলো লাল সালোয়ার সে নিয়ে এসেছে। সুতৰে ঘরে ফিরলেই নাদিয়া সেগুলো দেখতে পাবে। একথা শুনে নাদিয়ার চোখ ভিজে যায়। সাদা চাদর তুলে দেখায়, তার দুই পা কেটে ফেলা হয়েছে। এই দৃশ্য লেখকের মনকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। সে সিদ্ধান্ত নেয়, ফিলিস্টিন ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। বন্ধুকেও আহ্বান করে দেশে হিঁরে আসার।

যুদ্ধবিধিত দেশ ও সংকটাপন্ন ঋজনদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো অন্যদেশে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো মহসুস নেই। এই গল্পের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে দেশ ও ঋজনের বিপদে পাশে দাঁড়ানোই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব।

শব্দার্থ ও টীকা

- | | |
|-----------------|--|
| ফিলিস্টিন | — ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত, স্বাধীনতাকামী দেশ। |
| ক্যালিফোর্নিয়া | — আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্য। |
| শুকরিয়া | — কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার বীকার। |
| কুয়েত | — মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। |
| মাইনে | — বেতন। |
| কন্ট্রাক্ট | — চুক্তি। ইংরেজি Contract. |
| দাঁবনা | — উন্মুক্ত ভেতরের দিকের মাংসের অংশ। |
| হালচাল | — অবস্থা, দশা। |
| আগাপাশতলা | — আগাগোড়া, আপাদমস্তক। |

ଖୁଟିନାଟି	— ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ ସକଳ ବିଷୟ ।
ଆଟେପୁଟେ	— ସର୍ବାଙ୍ଗେ ।
ପିଛୁଟାନ	— ପିଛନେ ଫେଲେ ଆସା କୋଣୋ କିଛୁର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ।
ପାର୍ଥିବ	— ପୃଥିବୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ।
ଡିବେଲ	— ଉଚ୍ଛଲିତ, ଆକୁଳ ହେଁଯା ।
ଧବଧବେ	— ଅତିଶୟ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ।
ପଶଳା	— ବର୍ଷଣ । ଏଥାନେ ‘ଅନ୍ତ ପରିମାଣ’ ଅର୍ଥେ ।
ଆର୍ତ୍ତବ୍ରରେ	— କାତର ଘରେ, ବ୍ୟାକୁଳ କଟେ ।
ଖେଦ	— ଦୁଃଖ, ଅନୁତାପ, ଆକ୍ଷେପ ।
ତଳାତଳା	— ପୁଞ୍ଜାନୁପୁଞ୍ଜ, ସମନ୍ତ କିଛୁ, ଆଁତିପାତି ।
ଦପଦପ	— ବେଦନାର ଭାବପ୍ରକାଶକ ଶବ୍ଦ ।

ତିରନ୍ଦାଜ

ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସରକାର



ଦେକାଳେ ଦିଲ୍ଲିର କାହେ ହଞ୍ଜିଲା ନାମେ ଏକ ନଗର ଛିଲ । ଶାନ୍ତନୁ ସେଇ ହଞ୍ଜିଲାଯି ରାଜ୍ଯତ୍ତ କରିଲେନ । ଏକଦିନ ଶାନ୍ତନୁ ସମୁନାର ତୀରେ ବେଡ଼ାଇତେ ଗିଯା ଅପରୁପ ସୁନ୍ଦରୀ ଏକଟି କନ୍ୟା ଦେଖିତେ ପାଇଲେନ । ଏହି କନ୍ୟାର ନାମ ସତ୍ୟବତୀ । ଶିଶୁକାଳ ହଇତେ ଏକ ଧୀରର ତାଂହାକେ ପାଲନ କରିଯାଇଲି । ରାଜା ଧୀରରେର କାହେ ଗିଯା ତାଂହାର ପାଲିତ କନ୍ୟାଟିକେ ବିବାହ କରିତେ ଚାହିଲେନ ।

ଧୀରର ବଲିଲ, ‘ମହାରାଜ, ଆପନାର ଦେବବ୍ରତେର ମତୋ ସୋନାର ଚାଁଦ ହେଲେ ଥାକିତେ ସତ୍ୟବତୀର ଛେଲେର ରାଜ୍ୟ ପାଇବାର କୋନୋଇ ସମ୍ଭାବନା ନାଇ, କାଜେଇ ଏହି ବିବାହେ ଆମି ମତ ଦିତେ ପାରି ନା ।’ ଦେବବ୍ରତ ଏକଦିନ ଧୀରରେର କାହେ ଗିଯା ବଲିଲେନ, ‘ଆମାର ପିତାର ସହିତ ଆପନାର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଦିନ । ଭବିଷ୍ୟତେ ତାଂହାର ପୁତ୍ରୀ ରାଜା ହଇବେନ । ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଲେଛି, ଆମି କଥିନୋ ସିଂହାସନ ଦାବି କରିବ ନା ।’

ଧୀରର ବଲିଲ, ‘କୁମାର, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆପନାରଇ ଯୋଗ୍ୟ ବଟେ; କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ଲାଇଯା ପରେ ଆପନାର ପୁତ୍ରେରା ଯେ ଗୋଲଯୋଗ କରିବେନ ନା, ତାହାର ନିଶ୍ଚଯତା କିମ୍ବା? ତଥାନ ଦେବବ୍ରତ ବଲିଲେନ, ‘ଆଜ୍ଞା, ଆବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିତେଛି ଯେ, ଆମି ବିବାହରେ କରିବ ନା ।’ ଦେବବ୍ରତେର ଏହି ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଜନ୍ୟ ତାଂହାର ନାମ ହଇଲ ଭୀତି ।

ମହାସମାରୋହେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ ଓ ସତ୍ୟବତୀର ବିବାହ ହଇଯା ଗେଲ । ତାରପର ଯଥାକ୍ରମେ ତାଂହାଦେର ଚିଆସଦ ଓ ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହଇଲ । ଭୀତି ରାଜ୍ୟର ସକଳ ଅଧିକାର ତ୍ୟାଗ କରିଯାଓ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟର ସମକ୍ଷ ଭାର ଆନନ୍ଦେର ସହିତ ବହନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ବିଚିତ୍ରବୀର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ୋ ହଇଲେ ଅଧିକା ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକାର ସହିତ ତାଂହାର ବିବାହ ହୁଏ । କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଦୁଇ କନ୍ୟାର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ହଇଲ । ଅଧିକାର ପୁତ୍ରେର ନାମ ହଇଲ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର, ତିନି ଛିଲେନ ଜନ୍ୟାକ୍ଷ । ଆର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକାର ପୁତ୍ରେର ନାମ ପାତ୍ର ।

অন্ধ ছিলেন বলে ধূতরাষ্ট্র পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইতে পারিলেন না। দেশের লোক পাঞ্চকেই সিংহাসনে বসাইল। ইহাতে ধূতরাষ্ট্র খুবই দুঃখিত হইলেন। পাঞ্চের বড়ো ছেলের নাম যুবিষ্টির। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নামে তাঁহার আরও চারি পুত্র ছিলেন। ধূতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃখাসন প্রভৃতি একশত ছেলে আর দুঃখলা নামে একটি মেয়ে ছিল। পাঞ্চ কুরুবংশের রাজা হইলেও তাঁহার ছেলেগুলিকে লোকে ‘পাঞ্চ’ বলিত আর ধূতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলিত ‘কৌরব’।

বড়ো হইলে যুবিষ্টির হস্তিনার সিংহাসনে বসিবেন, এ দৃঢ় কি আর দুর্যোধন প্রভৃতির সহ্য হয়! ছেলেবেলা হইতেই পাঞ্চবন্দের প্রতি হিংসায় তাহাদের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এদিকে পাঞ্চের ছেলেদের সরল মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই সুখী হইত। কিন্তু পাঞ্চবন্দের সুখের দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। অতি শিশুকালেই তাহারা পিতৃহীন হইলেন। তখন যুবিষ্টির, ভীম প্রভৃতি পাঁচ ভাই ধূতরাষ্ট্রের একশত ছেলের সহিত একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্যোধন প্রভৃতির অন্তর যে কৃত কুটিল, পাঞ্চবেরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে লাগিলেন।

ফত্তিয়ের ছেলেরা শান্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শিখিতে আরম্ভ করে। রাজকুমারগণ কৃপাচার্য নামে একজন শিক্ষকের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ভীমের কিন্তু বরাবর এই ইচ্ছা যে, ভরমাজ মুনির পুত্র সুবিধ্যাত দ্রোগাচার্যের ওপর ছেলেদের অন্তর্শিক্ষার ভার দেন।

ঘটনাক্রমে একদিন দ্রোগ নিজেই হস্তিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শহরের বাহিরে পৌছিয়াই দ্রোগ দেখিলেন, রাজবাড়ির ছেলেরা উৎসাহের সহিত একটা শোহার গোলা লইয়া খেলা করিতেছে। খেলিতে খেলিতে গোলাটা হঠাৎ এক কুরার মধ্যে পড়িয়া গেল। তখন সকলেই উহা উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইল না। আচার্য এই ব্যাপার দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘ছি ছি! ফত্তিয়ের ছেলে হইয়া তোমরা এই সামান্য কাজটা পারিলে না! এই দেখ, আমি গোলা তুলিয়া দিতেছি—এই বলিয়া তিনি একটা শর লইয়া ওই গোলাতে বিন্দ করিলেন। তারপর শরের পেছনে শর, তার পেছনে আর একটা শর—পরে পরে এইভাবে বিন্দ করিয়া শেষের শরটি ধরিয়া অঙ্গেশেই গোলা টানিয়া তুলিলেন। গোলা উঠান হইলে ব্রাহ্মণ কুরার মধ্যে নিজের আংটি ফেলিয়া তাহাও ওইরূপ কৌশলে উঠাইয়া আনিলেন। ব্যাপার দেখিয়া সকলে তো অবাক!

দেখিতে দেখিতে এ খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের আশচর্য শক্তির কথা শুনিয়া ভীমের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, বয়ং দ্রোগাচার্য আসিয়াছেন। কেননা, এ কাজ আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। তিনি মনে মনে এতদিন যাহা চাহিতেছিলেন, তাহাই হইল—দ্রোগ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার পর আচার্যকে যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া ভীম তাঁহার ওপর ছেলেদের অন্তর্শিক্ষার ভার দিলেন। এক্রপ আদর-যত্ন এবং হঠাৎ এতগুলি শিষ্য পাইয়া দ্রোগের তখন কী আনন্দ! তিনি বলিলেন, ‘বৎসগণ, আমি তোমাদিগকে এমন করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইব যে লোকের তাক লাগিয়া যাইবে। শেষে কিন্তু আমার একটি কাজ করিয়া দিতে হইবে।’

আচার্যের কথা শুনিয়া আর সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কেবল অর্জুন বলিলেন, 'বলুন কী করতে হবে? আপনার আদেশ কথনও অমান্য করিব না।'

অর্জুনের কথায় গীত হইয়া দ্রোগ তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া আদর করিলেন। তারপর ঢোকের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'সে কথা পরে বলিব।' সেইদিন হইতে আচার্য অর্জুনকে ঠিক নিজের ছেলের মতো ভালোবাসিতে লাগিলেন।

যথারীতি ছেলেদের অক্ষণিকা আরম্ভ হইল। রাজকুমারদের সহিত আর যাহারা দ্রোগের নিকট শিক্ষা পাইত, তাহাদের মধ্যে কর্ণই প্রধান। এই কর্ণকে লোকে অধিরথ সারথির ছেলে বলিয়া জানিত। কিন্তু বাঞ্ছিক সে যুধিষ্ঠিরের সহোদর—কৃষ্ণের জ্যৈষ্ঠপুত্র। কর্ণের জন্মের পর কৃষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। কৃষ্ণ যে কর্ণের মা, এ কথা আর কেহই জানিত না। কর্ণ নিজেও এ কথা অনেককাল পর্যন্ত জানিতে পারে নাই।

দ্রোগের শিক্ষাগুণে কয়েক মাসের মধ্যে সকলেরই খুব উন্নতি হইল। ধনুর্বিদ্যায় অর্জুন একজন অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিলেন। গদায় দুর্যোধন ও ভীম এবং খড়গে নকুল ও সহদেব খুব নাম কিনিলেন। আচার্যের মুখে অর্জুনের প্রশংসা আর ধরে না। তিনি মনে করিলেন, 'এই প্রিয় শিষ্যটিকে এমন সকল কৌশল শিখাইব যে, গৃথিবীতে কেহই যেন ইহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারে।' আর সত্যই, কাজেও তিনি তাহা করিলেন।

অর্জুনের আদর দেখিয়া হিংসায় দুর্যোধন আর বাঁচে না। কর্ণ বরাবরই অর্জুনকে ঘৃণা করিত। এখন হইতে সেও দুর্যোধনের দলে যোগ দিয়া কথায় পাঞ্চবদ্রের অপমান করিতে লাগিল।

এই সময় একদিন দ্রোগ কুমারগণের পরীক্ষার জন্য একটি নীলরঙের পাথি প্রস্তুত করিয়া গাছের ডালে বসাইয়া দিলেন। তারপর সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওই যে পাথিটি দেখিতেছ, উহার মাথা লক্ষ্য করিয়া তির ছুঁড়িতে হইবে। মাথাটি কাটিয়া ফেলিতে পারিলে বুঝিব আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।'

এ কথায় চারিদিকেই উৎসাহের শ্রোত বহিতে লাগিল। অমে রাজকুমারগণ তির-ধনুক লইয়া প্রস্তুত হইলেন। তখন দ্রোগ যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল দেখি তুমি কী দেখিতেছ?' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'একটা পাথি দেখিতেছি।' দ্রোগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কী দেখিতেছ?' যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'গাছের ডালপালা সবই দেখিতেছি, আপনাদের সকলকেও দেখিতেছি।'

এরপ উভয়ে দ্রোগ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; বলিলেন, 'না বাপু, এখনও তোমার নজরই ঠিক হয় নাই।'

ইহার পর তিনি এক-এক করিয়া প্রায় সকলকেই ডাকিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনের মতো উভয় দিতে পারিল না। শেষে অর্জুনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বলো দেখি কী দেখিতেছ?' অর্জুন বলিলেন, 'আমি শুধু পাথির মাথা দেখিতেছি, আর কিছুই না।' এইবার দ্রোগের মুখ প্রকুপ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, মাথাটি কাট দেখি।' আচার্যের মুখের কথা না-ফুরাইতেই অর্জুনের বাণে পাথির কাটা-মাথা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আর একদিন দ্রোগকে কুমিরে ধরিয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই কুমিরকে মারিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না-করিয়া যেন মহাবিপদেই পড়িয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া চিত্কার করিতে লাগিলেন। কুমারেরা ভয়ে একেবারে জড়সড়, কিন্তু অর্জুনের মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। তিনি তখনই কয়েকটা বাণ মারিয়া কুমিরকে খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

ইহাতে দ্রোগ যে কীরূপ সন্তুষ্ট হইলেন, তাহা আর কী বলিব! তিনি অর্জুনকে আশীর্বাদ করিয়া ‘ত্রুক্ষশিরা’ নামে এক অন্ত পুরস্কার দিলেন। সে অতি ভয়ানক অন্ত। তাহার তেজে স্বর্গ-মর্ত্য কাঁপিয়া ওঠে। মানুষের উপর সে অন্ত ছাড়িতে আচার্য কিন্তু অর্জুনকে নিয়ে ধরিয়া দিলেন।

ইহার পর আরও কিছুদিন চলিয়া গেল। কৃষ্ণ সকলেই এক-একজন বীর হইয়া উঠিলেন। এইবার দশজনের সাক্ষাতে কুমারদের রংকৌশল প্রদর্শনের সময় উপস্থিতি।

দ্রোগের পরামর্শে অন্ধরাজ থকাও এক রঙভূমি প্রস্তুত করাইলেন। উহার মাঝখানে খেলিবার স্থান এবং চারিদিকে রাজা-রাজড়া ও বড়ো বড়ো বীরদিগের বসিবার জন্য সুন্দর সুন্দর ঘণ্ট। মহিলাগণের জন্য অত্যন্ত আসন। বিচির পত্র-পুষ্পে, বিশাল-কালরে সমুদয় রঙভূমি বালমূল করিতে লাগিল।

আগেই দেশে দেশে ঢোল পিটাইয়া এ সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার দিন রঙভূমি একেবারে লোকে লোকারণ্য। তাহাদের কোলাহলে ও বাদ্যের শব্দে সারা দেশ মাতিয়া উঠিল।

যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীম, কৃগ, বিদ্যুর প্রমুখ সভায় প্রবেশ করিলেন। তারপর মান্য ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা চলিতে লাগিল। কৃষ্ণ মহিলাগণ আসিয়া উপস্থিতি হইলেন। শেষে দেশ-বিদেশের ছোটো-বড়ো কেহই আর আসিতে বাকি থাকিল না। সকলে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলে, আচার্য দ্রোগ শ্বেতবসনভূষণে সজ্জিত হইয়া রঙভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

কুমারগণ সারি বাঁধিয়া দলে দলে দেখা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সাজসজ্জা আর অন্তের চাকচিকে চারিদিকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জয়ধরনি ও বাদ্য-কোলাহল থামিলে দুর্ধোধন আর ভীম গদাহস্তে অচসর হইলেন। তাঁহাদের চালচলন ও যুদ্ধের কৌশল কী সুন্দর! কিন্তু কিছুক্ষণ খেলিতে খেলিতে উভয়ে এমন উভেজিত হইয়া উঠিলেন যে, দ্রোগাচার্য তাঁর পাইয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

গদা-খেলার পর কুমারগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া নকল যুদ্ধের অভিনয় দেখাইয়া সকলাক চমৎকৃত করিলেন। শেষে আসিলেন অর্জুন। যেমন বীরের ন্যায় চেহারা, তেমনি তাঁহার হাতের কায়দা। তিনি অগ্নিবাণে চারিদিকে আঙুল জ্বালাইয়া, বক্ষবাণে তখনই আবার তাহা নিভাইয়া ফেলিলেন; এক বাণে আকাশে বায়ু ও মেঘের সূচি করিলেন, এক বাণে বিশাল পর্বত গড়িলেন, এক বাণে নিজেই ভূমিতে প্রবেশ করিয়া পর-মুহূর্তেই আবার বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাণে কখনও রৌদ্র, কখনও রেঁঝ, কখনও বৃষ্টি-য়েন বাজিকরের ভেলকি! লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল। শেষে অর্জুন এক বাণে আপনাকে এমন করিয়া লুকাইলেন যে, কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। আশ্চর্য শিক্ষা!

অর্জুনের জয়ধরনিতে চারিদিক ভরিয়া উঠিল।

লেখক-পরিচিতি

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার চরিত্র পরগনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক ও প্রকাশক, কিন্তু শিশুসাহিত্য রচনা হিল তাঁর সারা জীবনের লক্ষ্য। তরঙ্গ বয়সেই ‘সখা’, ‘সখী’, ‘যুকুল’, ‘বালকবন্ধু’, ‘বালক’ প্রভৃতি শিশুপত্রিকায় লিখে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর উজ্জ্বল বিষয়বস্তুর ছড়াগুলো ছোটোদের আনন্দের জন্য অসাধারণ সৃষ্টি। তাঁর রচিত সচিত্র ‘হাসি ও খেলা’ বইটি বাংলায় প্রথম শিশুতোষ বই। যোগীন্দ্রনাথের অপর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে ‘যুকুমণির ছড়া’, ‘ছবি ও গল্প’, ‘রাঙা ছবি’, ‘হাসিখুশি’, ‘হাসিরাশি’, ‘বনে জঙ্গলে’, ‘পন্ডপক্ষী’ ‘ছোটোদের মহাভারত’ প্রভৃতি। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

গল্পাংশটি ছোটোদের জন্য লেখা মহাভারতের ‘আদিপর্ব’ থেকে নেওয়া হয়েছে। গল্পের মূল বিষয় পাণ্ডু ও কুরুর সন্তানদের মধ্যকার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন। অক্ষিবিদ্যার গুরু দ্রোগাচার্য হস্তিনাপুর এলে ভীম তাঁকে রাজকুমারদের শিক্ষক হিসেবে সাদরে গ্রহণ করেন। দ্রোগাচার্যও ততোধিক লেহ ও সবত্তে কুমারদের যুদ্ধবিদ্যা শেখালেন। রাজকুমার অর্জুন তার কাছে সর্বাধিক ধিয় হয়ে ওঠেন। এতে কৰ্ণ ও দুর্যোধনরা পাঞ্চবন্দের প্রতি রঞ্চ হন। অক্ষিবিদ্যা শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে অর্জুনের পারদর্শিতায় মুক্ত হয়ে আশীর্বাদ হিসেবে দ্রোগাচার্য তাঁকে ‘ব্রহ্মশিরা’ অৱু পুরষ্কার দেন। এক পর্যায়ে একাশে রণক্ষেত্রে রাজকুমারদের রণকৌশল প্রদর্শনী করা হলে সবাই যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়ে সকলকে মুক্ত করেন। অর্জুনের রণকৌশল সর্বাধিক প্রশংসিত হয়। আগ্রহ, চর্চা, নিষ্ঠা ও গুরুভূতি মানুষকে যেকোনো কঠিন কাজে যে পারদর্শী করে তুলতে পারে, এখানে তা-ই ফুটে উঠেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

তিরন্দাজ	- তির ছুড়ে যে।
দ্রোগাচার্য	- মহাভারতের কুরুবংশের গুরু বা শিক্ষক। ইনি অক্ষশিক্ষা দিতেন। অন্যনাম, দ্রোগ।
অক্ষশিক্ষা	- অক্ষ চালানোর বিদ্যা বা জ্ঞান।
ক্ষত্রিয়	- জাতি বিশেষ। হিন্দু বর্ণভেদ অনুযায়ী চার বর্ণের বিতীয় বর্ণ বা জাতি।
ধনুর্বিদ্যা	- ধনুক চালানোর বিদ্যা বা জ্ঞান।
আঁটিয়া	- পেরে ওঠা।
মুনি	- ঝুঁঁটি। যারা ধ্যানে মগ্ন থাকেন।
হস্তিনা	- কৌরবদের রাজধানী।
গোলা	- লোহা দিয়ে বানানো গোল আকৃতির এক ধরনের অক্ষ। কামান বা বন্দুক থেকে তা নিক্ষেপ করা হয়।
ভীম	- মহাভারতের কৌরব ও পাঞ্চবন্দের পিতামহ বা দাদা।
আচার্য	- শিক্ষক। যিনি শাস্ত্র অনুযায়ী শিক্ষা দেন।

ସାରଥି	— ରଥଚାଲକ ।
କୁଣ୍ଡି	— ପାଞ୍ଚବଦେର ମା ।
ଗଦା	— ଏକ ଧରନେର ଅଞ୍ଜ । ଶକ୍ତ ଓ ମୋଟା ଲାଠି, ମୁଣ୍ଡର ।
ଖଡ୍କ	— କାଟା ଯାଇ ଏମନ ଭାରି ଓ ଧାରାଲୋ ଶକ୍ର; ଖାଡ଼ା ।
ବାଗ	— ଧନ୍ୟକ ଥେକେ ଛୋଡ଼ାଇ ଏକ ଧରନେର ଅଞ୍ଜ । ତିର, ଶର ।
ରଙ୍ଗଭୂମି	— ଅଭିନ୍ୟାଷ୍ଟେତ୍ର, ମଧ୍ୟ ।
ଲୋକାରଣ୍ୟ	— ଲୋକେ ଡରପୁର । ଥିବା ଲୋକସମାଗମ ହୟ ସେଥାନେ ।
ଶ୍ଵେତବସନ୍ତୁଷ୍ଟନ	— ସାଦା ରଙ୍ଗର ପୋଶାକେ ସଜ୍ଜିତ ।
କୃପ	— କୁରୁପାଞ୍ଚବଦେର ଶିକ୍ଷାଣ୍ତର । ଅନ୍ୟ ନାମ କୃପାଚାର୍ୟ ।
ବିଦୁର	— ମହାଭାରତେର ରାଜା ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରେର ଭାଇ ।
ବରମଧାଣ	— ଏକ ଧରନେର ଅଞ୍ଜ । ପାନି ଦିଯେ ତୈରି ଅଞ୍ଜ ।
ବାଜିକର	— ଜାଦୁକର ।

নাটক

মানসিংহ ও ইসা খাঁ

ইত্তীব্র খাঁ



[ছান : এগারোসিদ্ধুর পরপারে মহারাজ মানসিংহের শিবির।

চরিত্র : মানসিংহ, দুর্জয়সিংহ ও দৃত]

মানসিংহ

: শোলা যায়, একদা এক অসুররাজ গোল্পদে ডুবে মরেছিল। একথা বিশ্বাস করো,
দুর্জয়সিংহ?

দুর্জয়সিংহ

: এ পুরাণের কথিনিমাত্র। বিশ্বাস করি না!

মানসিংহ

: আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না, দুর্জয়সিংহ, কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।

দুর্জয়সিংহ

: সত্যি বিশ্বাস করেন, মহারাজ?

মানসিংহ

: চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দুর্জয়সিংহ, তাতে বিশ্বাস না-করি কেমনে, তাই বলো।
নইলে বাংলার এক অভ্যানন্দমা কুন্দ পাঠানসর্দার ইসা খাঁ, তারই তলোয়ারতলে মারা যায়
ক্ষত্ৰ-বীৰ মানসিংহের আপন জামাতা?

দুর্জয়সিংহ

: আশ্চর্যই বটে!

মানসিংহ

: মানুষ হয়ে জন্মেছিল, একদিন তো সে মরতই—না—হয় দুদিন আগে মরেছে। কিন্তু
রাজপুতনার মঙ্গসিংহ মারা গেল বাংলার বকরির হাতে—এ দুঃখ রাখবার ছান কোথায়,
দুর্জয়সিংহ?



দুর্জয়সিংহ

: মহারাজ, এ দুঃখ করতে পারেন।

- মানসিংহ : জামাতা নিহত হয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে বড়ো দুঃখ যে, এই কাহিনি শুনে রাজপুতনার নারীরা হাসবে, শক্ররা উপহাস করে রটনা করবে, আমি নিজে ভয় পেয়ে ঈসা খাঁর সামনে আমার জামাতাকে পাঠিয়েছিলাম। অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।
- দুর্জয়সিংহ : এ বিধাতার বিধান, মহারাজ, সরে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কী?
- মানসিংহ : না। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব—আমি ঈসা খাঁকে হত্যা করব।
- দুর্জয়সিংহ : কিন্তু সে কী করে সম্ভব হবে?
- মানসিংহ : ঈসা খাঁ আমাকে দ্বন্দ্যবুদ্ধের আহ্বান করেছিল, পাঠিয়েছিলাম আমার জামাতাকে। আমার জামাতাকে হত্যা করে ভেবেছে, সে বুঝি মানসিংহকেই হত্যা করেছে। আমি তাকে জানিয়েছি, ঈসা খাঁর মুওপাত করার জন্য মানসিংহ এখনও জীবিত রয়েছেন। এবার দ্বন্দ্যবুদ্ধের আহ্বান গিয়েছে আমার তরফ থেকেই।
- দুর্জয়সিংহ : কোনো উত্তর পেয়েছেন?
- মানসিংহ : না, তবে এক্ষুনি পাব। জানি না; সে কাপুরুষ পুনরায় দ্বন্দ্যবুদ্ধে রাজি হবে কিনা।
- দৃত : (প্রবেশাত্তে কুর্নিশ করিয়া) মহারাজের জয় হোক!
- মানসিংহ : কি সংবাদ, দৃত?
- দৃত : সংবাদ শুভ। মহারাজকে হত্যা করেছে ভেবে তারা উৎসব করছিল; এমন সময় আপনার আহ্বান নিয়ে আমি হাজির! তবে ঈসা খাঁ এ আহ্বান গ্রহণ করেছেন।
- মানসিংহ : গ্রহণ করেছেন? অনেকক্ষণ পরে নিশ্চয়ই?
- দৃত : না মহারাজ! তঙ্কুনি গ্রহণ করেছেন।
- মানসিংহ : তঙ্কুনি? আচ্ছা, তা বেশ। কোনো জবাব এনেছে?
- দৃত : এনেছি, মহারাজ! তবে দেখাতে সাহস হয় না।
- মানসিংহ : তোমাকে অভয় দিচ্ছি, দৃত।
- দৃত : মহারাজ, ঈসা খাঁ লোকটা, নিতান্ত... নিতান্ত... এই নিতান্ত...
- মানসিংহ : নিতান্ত কী?
- দৃত : আজ্ঞে, নিতান্ত গৌয়ার। কারণ মহারাজের আহ্বানপত্র পেয়েই অমনি তলোয়ার খুলেন, তারপর নিজের হাত কেটে তারই রক্তে তলোয়ারের ডগা দিয়ে উত্তর লিখলেন—‘বৃত্ত আচ্ছা’।

২.

[ছান : লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে পাঠান শিবির, অন্যদিকে মোগল শিবির। অদূরে এগারোসিঙ্কুর কেল্লা—ময়দানের মাঝখানে ঈসা খাঁ ও মানসিংহ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে।]

- ঈসা খাঁ : নমস্কার, মহারাজ।
- মানসিংহ : আদাৰ, খাঁ সাহেব।
- ঈসা খাঁ : এত তক্লিফ করে এখানে না—এসে মহারাজ যদি আদেশ করতেন, তবে দিল্লিতে গিয়েই মহারাজের সঙ্গে আমি একহাত শাড়ে আসতাম।

- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : বাংলার বোপে-জঙ্গলে আপনারা কেমন আছেন, একটু দেখতে শখ হলো, খাঁ সাহেব।
ঈসা খাঁ : রাজপুতনার মর-পর্বতের কোন অঙ্ককার গুহায় মহারাজ কীরণে থাকেন, তা দেখবার
কৌতুহলও তো এ বান্দার হতে পারত!
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : পাঠানেরা দেখছি ইদানীং কথা বলতে শিখেছে।
ঈসা খাঁ : এ আপনাদের মতো কথা-সর্বস্থদের সঙ্গে থাকার ফল। আগে পাঠানেরা কথা বলত না; কথা
বলত কেবল তাদের তির আর তলোয়ার।
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : ইদানীং বুবি তাহলে পাঠানদের তির-তলোয়ার ভোঁতা হয়ে পড়েছে!
ঈসা খাঁ : শাহি ফৌজের ওপর ক্রমাগত ব্যবহারে একটু ভোঁতা হয়েছে বৈকি!
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : তাহলে এখন তলোয়ার ছেড়ে কাবুলি মেওয়ার কারবার শুরু করলে হয় না, খাঁ সাহেব?
ঈসা খাঁ : কিন্তু কাবুলি মেওয়া এখানে থাকে কে? মহারাজের তো বাজরার খিচুড়ি আর ঘাসের কুটি
খেয়ে খেয়ে পেট এমনি হয়েছে যে, কাবুলি আঙুরের গঁজেই বয়ি আসে।
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : কিন্তু খাঁ সাহেব কি কেবল কথার যুদ্ধের জন্যই তৈয়ার হয়ে এসেছেন, না আরও কোনো
মতলব আছে?
- ঈসা খাঁ : সে সম্পূর্ণ মহারাজের অভিকৃতি। ঈসা খাঁ যে কোনো সময়ে যে কোনো ছানে যে কোনো অন্তে
যে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : মনে হচ্ছে, শাহবাজ খাঁকে প্রাণিত করে ঈসা খাঁর অহংকার বেড়েছে। কিন্তু ঈসা খাঁ কেবল
যুদ্ধ দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নাই।
ঈসা খাঁ : কিন্তু ফাঁদের সঙ্গে যে এ বান্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটেছে—এই মাত্র সেদিন—সে তো
মহারাজের অজানা থাকবার কথা নয়।
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : সে কথা জানি, কাপুরুষ। আমার জামাতা—এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক—বাগে পেয়ে তাকে
তুমি হত্যা করেছ।
ঈসা খাঁ : খবরদার মানসিংহ। ঈসা খাঁকে ‘কাপুরুষ’ বলে কেউ কোনোদিন রেহাই পায় নাই। আর
ঈসা খাঁ নিজে পর্দার আড়ালে থেকে জামাতাকে কখনও লড়াইয়ে পাঠায় নাই। কিন্তু আজ
তোমাকে ক্ষমা করছি—সেই মহান যুবকের নামে, যিনি বীরের মতো যুদ্ধ করে সমর শয়া
গ্রহণ করেছেন।
- মানসিংহ
ঈসা খাঁ : ভূতের মুখে রায় নাম! কিন্তু আত্মসংক্ষা করো, ঈসা খাঁ।
ঈসা খাঁ : তুমিও আত্মসংক্ষা করো মানসিংহ।
- ঈসা খাঁ : যুদ্ধ শুরু হইল : লড়িতে লড়িতে ঈসা খাঁর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহের তলোয়ার ভাঙিয়া পড়িয়া
গেল—নিরঞ্জন মানসিংহ ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]
- ঈসা খাঁ : এখন মহারাজকে রক্ষা করবে কে?
মানসিংহ : কেউ না; তুমি আমাকে হত্যা করো, ঈসা খাঁ।
ঈসা খাঁ : না, মহারাজ, সে হয় না। নিরঞ্জনের ওপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।

মানসিংহ

: তবে আমাকে বন্দি করো, আমি তোমার অন্ধক চাই না।

ঈসা খাঁ

: তাও হয় না মহারাজ। আপনার মতো সাহসী যোদ্ধাকে বাগে পেয়ে আমি বন্দি করব না।

এই নিন আমার তলোয়ার—যুদ্ধ করুন।

[নিজ তলোয়ার মানসিংহের হাতে তুলিয়া দিয়া বাঘ কঢ়ি হইতে অন্য তলোয়ার খুলিয়া দাঁড়াইলেন।]

মানসিংহ

: [একটু ভাবিয়া তলোয়ার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন] আমি লড়ব না।

ঈসা খাঁ

: কেন, মহারাজ?

মানসিংহ

: আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই।

ঈসা খাঁ

: বটে।

মানসিংহ

: ঈসা খাঁ, চমৎকার। দূর হতে তোমার কত নিন্দাই শুনেছি, ভাই কাছে এসেও এতদিন তোমাকে চিনতে পারি নাই। আজ তোমার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় হলো, এই-ই আমার পরম লাভ! তোমাকে চিনবার আগে মরলে মানসিংহের জীবনে একটা মন্ত ফাঁক থেকে যেত।

ঈসা খাঁ

: মহারাজ-ভাই-তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমিও ধন্য।

মানসিংহ

: তবে, এসো ভাই! [আলিঙ্গন] আমাদের এই আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে মোগল-পাঠানের বস্তুত হোক, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক আর কখনো আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পৰিত্ব বক্ষ কলঙ্কিত করব না।

লেখক-পরিচিতি

ইব্রাহীম খাঁ-র জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলের এক কৃষক পরিবারে। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। সারা বাংলায় তিনি প্রিসিপাল ইব্রাহীম খাঁ নামে পরিচিত। অসাধারণ অনেক ছোটোগল্প, প্রবক্ষ, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনি ও শিশুসাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ছান দখল করে আছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ‘কামাল পাশা’, ‘আনোয়ার পাশা’ প্রভৃতি নাটক; ‘আলু বোথরা’, ‘দাদুর আসর’ গল্পগুচ্ছ; ‘ইন্দুশূল যাত্রীর পত্র’ ভ্রমণ-কাহিনি। বাংলা নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। ইব্রাহীম খাঁ ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

ইব্রাহীম খাঁ এই নাট্যাংশে হাজির করেছেন ঈসা খাঁ ও রাজপুত বীর মানসিংহের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহানুভবতাৰ কাহিনি। বাংলার পাঠান বীর ঈসা খাঁ দ্বন্দ্যবৃক্ষে নিহত করেন মানসিংহের বীর জামাতাকে। প্রতিশোধ নিতে মানসিংহ এগারোসিক্ত ময়দানে ঈসা খাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। ঈসা খাঁ বীরত্বের সঙ্গে তা প্রহণও করেন। যুদ্ধ চলাকালে হঠাৎ মানসিংহের তলোয়ার ভেঙে গেলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন। কিন্তু ঈসা খাঁ নিরঞ্জ মানসিংহকে আঘাত না করে তাঁর হাতে অপর একটি তলোয়ার তুলে দেন। ঈসা খাঁৰ বীরত্ব ও উদার্যে মানসিংহ বিশিষ্ট হয়ে তলোয়ার ছুড়ে ফেলে জানান, ঈসা খাঁৰ সঙ্গে তাঁৰ কোনো যুদ্ধ নেই। তারপৰ দুই বীর পরম্পরারের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হন। দুজনেই ভারতের মোগল-পাঠান আৰ হিন্দু-মুসলমানের বস্তুত ও মিলনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। নাট্যাংশটিতে মোগল-ভারত আমলেৰ বীরত্ব, মহানুভবতা ও ভাতৃত্ববোধেৰ পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রতিফলিত হয়েছে মানুষেৰ উদারতা ও মহানুভবতা।

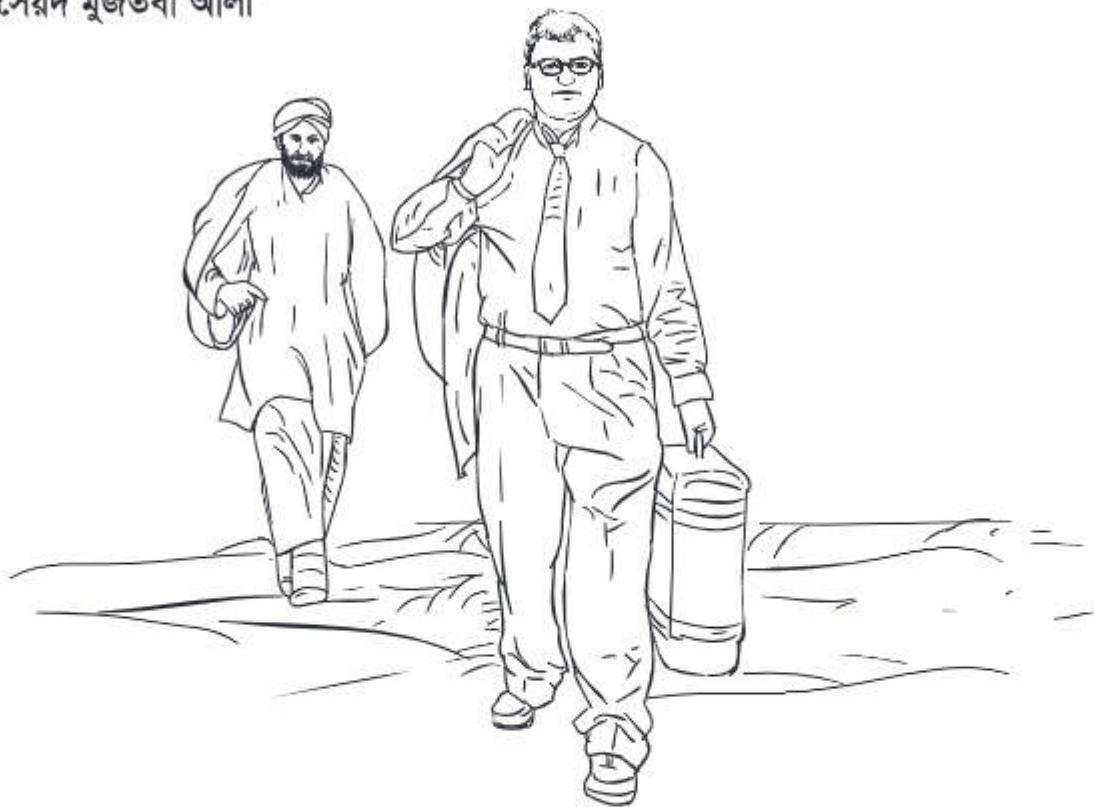
ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ଟୀକା

ଏଗାରୋସିଙ୍କୁ	— କିଶୋରଗଙ୍ଗେର ଏକଟି ନଦୀ ।
ମାନସିଂହ	— ରାଜପୁତ ବୀର ।
ଈସା ଥୀ	— ପାଠାନ ବୀର । ବାହ୍ଲାର ବାରୋ ଭୁଇୟାଦେର ଏକଜଳ ।
ଦୁର୍ଜ୍ୟସିଂହ	— ମାନସିଂହେର ସହଚର ।
ଅସୁରରାଜ	— ଅସୁରଦେର ରାଜ୍ଞୀ ।
ଗୋଲ୍ପଦ	— ଗର୍ଭର ଖୁରେର ଚାପେ ତୈରି ଗର୍ତ୍ତ ।
କ୍ଷତ୍ର-ବୀର	— କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ।
ବକରି	— ଛାଗଳ ।
ମେଓଡା	— ଫଳ ବିଶେଷ ।
ବାଜରା	— ଶସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ।
ରାଜପୁତନା	— ଭାରତେର ରାଜଷ୍ଠାନେର ଅପର ନାମ ।
କୁର୍ଣ୍ଣିଶ	— ମାଥା ନତକରା ।
ଆହ୍ଵାନପତ୍ର	— ଦାୟୀତା ଲିପି ।
ଡଗା	— ଅଛାଭାଗ ।
ବହୁତ ଆଛା	— ଖୁବ ଭାଲୋ ।
ତକଳିକ	— କଟ ।
କଥାସର୍ବଧ	— କଥାଇ ସାର ସେଖାନେ ।
ଫାଁଦ	— କୌଶଳ, ହୃଦ । ପଣ୍ଡପାଦି ଧରାର ଯତ୍ରବିଶେଷ ।
ଓଯାର	— ଆୟାତ ।
ଅନୁଧାତ	— ଦୟା ।

অমণ-কাহিনি

কাবুলের শেষ প্রহরে

সৈয়দ মুজতবা আলী



সকালবেলা ঘূম থেকে উঠেই মনে গড়ল, আবাদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। ঝটি, মামলেট, পনির, চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল। মৌঙানা এসে বললেন, চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পাউন্ড লাগেজ নিয়ে যেতে দেবে। কী রাখি, কী নিয়ে যাই?

যারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারদিকে তাকালাম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কী, আর রেখে যাব কী?

ওই তো আমার দু ভল্যম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মক্ষে থেকে ট্রেনে করে তাশখন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আনুদরিয়া, তারপর থেয়া পেরিয়ে, খচরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্তান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের ঢাঢ়াই-উত্তরাই ভেঙে এসে পৌছেছে কাবুল। ওজন পাউন্ড ছয়েক হবে।

ভুলেই গিয়েছিলাম। এক জোড়া চীনা 'ভাঙ'। পাতিনেবুর মতো রং আর চোখ বঙ্গ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলাচ্ছি, একটু জোরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভেতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটোখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দিনের প্রদীপ।

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা।

মৌলানা তার এক পাঞ্জাবি বস্ত্র সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবদুর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, ‘আবদুর রহমান, তোমার ওপর অনেকবার খামোখা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।’

আবদুর রহমান আমার দু-হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের ওপর চেপে ধরল। ভেজা। আমি বললুম, ‘ছিং আবদুর রহমান, এ কী করছ? আর শোনো, যা রাইল সবকিছু তোমার।’

রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটিলি-হাতে আবদুর রহমান।

দু-একবার তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলাম। হাওয়াই জাহাজের খাঁটি আর বেশি দূর নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাবুলের দিকে তাকালাম। এই নীরস নিরানন্দ বিপদসংকুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো শুষ্ঠু মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু বোধ হয় এই সব কারণেই যে লোকের সঙ্গে আমার হ্রদ্যতা জন্মেছিল তাঁদের প্রত্যেককে অসাধারণ আত্মজন বলে মনে হতে লাগল। এঁদের প্রত্যেকেই আমার হৃদয় এতটো দখল করে বসে আছে যে, এঁদের সকলকে একসঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হলো আমার সন্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসিতে বলে ‘পার্টি সে তাঁ প্য মুরির’, প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ে দুরে ওজন করা হলো। কারো পোটলা দশ পাউন্ডের বেশি হয়ে যাওয়ায় তাদের মন্তকে বজ্রাঘাত। অনেক ভেবেচিত্তে যে কর্ণটি সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে হের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

এইটুকু ওজনের ভিত্তির আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন! লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম, কই তেমন কিছু খাপসুরত অ্যাপোলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে বেরোবার সময় বাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তাহলে মিথ্যা নয়।

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পাউন্ডের পুঁটিলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস র্যাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কি একটা বিড়বিড় করল। বুঝলাম, সে ওই র্যাকেটখানাকেই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিতুম না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মতো। তার বিশ্বাস ক্ষেত্র মাঝেই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনো খোলা না যায়। ‘অপটিমাম’ শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হকুম দিয়েছিলাম, র্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থানে যাবে।

দেখি স্যার ফ্রাঙ্কিস। নিতান্ত সামনে, বয়েসে বড়ো, তাই একটা ছোটাসে ছোটা নড় করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘গুড মর্নিং আই উইশ এ গুড জার্নি।’

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, ‘তারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, তারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।’

আমি বললুম, ‘আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলব।’

সায়েব ভোংতা, না ঘড়েল ডিপ্রোমেট, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্তানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে ‘বৃ আমানে খুদা’—‘তোমাকে খোদার আমানতে রাখলাম’, যে যাচ্ছে না সে বলে ‘বৃ খুদা সপুর্দমৎ’—‘তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলাম।’

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললাম, ‘বৃ আমানে খুদা, আবদুর রহমান’, আবদুর রহমান মঙ্গোচারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল ‘বৃ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব, বৃ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব।’

হঠাতে ওনি স্যার ফ্রাঙ্কিস বলছেন, ‘এ-দুর্দিনে যে টেনিস র্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্কোর্টসম্যান।’

লিগেশনের এক কর্মচারী বললেন, ‘ওটা দশ পাউন্ডের বাইরে পড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।’

সাহেব বললেন, ‘ওটা প্রেনে তুলে দাও।’

ওই একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, ‘বৃ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব, বৃ খুদা সপুর্দমৎ।’

প্রগেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের তারঙ্গের চিত্কার প্রেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাতুয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড় ডরায়। তাই খোদাতালার কাছে সে বাববার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্রেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলাম, ‘সপুর্দমৎ’। আফগানিস্তানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান আমায় বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাত্রিবিপূর্বে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শুশান বলি তবে আবদুর রহমান শুশানেও আমাকে কাঁধ দিল। দ্বয়ং চাগক্য যে কর্যটা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্বাচিত শেষ করেছেন আবদুর রহমান সব কয়টাই উত্তীর্ণ হলো। তাকে বাঞ্ছব বলব না তো কাকে বাঞ্ছব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করত্ব।

মৌলানা বললেন, ‘জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও’ বলে আপন সিটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর এয়ারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হলো চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি, আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হাদয়।

লেখক-পরিচিতি

সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে সিলেটের করিমগঞ্জ (বর্তমান ভারতের কাছাড়) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট সরকারি স্কুলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অর্জন করেন পিএইচডি ডিগ্রি। সৈয়দ মুজতবা আলীর কর্মজীবন শুরু হয় আফগানিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগে। সৈয়দ মুজতবা আলী ভ্রমণ ও রম্যসাহিত্য রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। তিনি বাংলা গদ্যে হাস্যরসের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। ‘দেশে-বিদেশে’, ‘পঞ্চতঙ্গ’, ‘চাচা কাহিনী’, ‘শবনম’ তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ-পরিচিতি ও মূলভাব

বর্তমান অংশটি লেখকের বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনি ‘দেশে-বিদেশে’ এস্টের শেষ পরিচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত অংশবিশেষ। আফগান সরকারের শিক্ষা বিভাগে কাজ করার সময় লেখক কাবুলে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর গৃহপরিচারক আবদুর রহমানের সঙ্গে গড়ে উঠে এক গভীর মানবিক সম্পর্ক। গৃহকর্ম ছাড়াও লেখকের দেখভালের প্রতিও আবদুর রহমানের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিছুদিন পর কাবুলে হঠাৎ অরাজক পরিহিতি সৃষ্টি হলে খাবার-দাবারসহ নিরাপত্তারও সংকট দেখা দেয়। এ সংকটে লেখক ও আবদুর রহমান অল্প খাবার ভাগ করে খেতেন। এ পরিহিতিতে দেশে ফিরে আসার জন্য লেখক বিমানের একটি আসন লাভ করেন। বিমানবন্দরে আবদুর রহমানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের সময় আবেগিনী অবস্থার সৃষ্টি হয়। আফগানিস্তানে লেখকের উচ্চপদস্থ বহু বক্স থাকা সত্ত্বেও আবদুর রহমানকেই পরম বাঞ্ছিব বলে তিনি খীকৃতি দিয়েছেন।

মানুষের প্রতি ভালোবাসার সত্যিকারের প্রকাশ জাতি বা শ্রেণিতে আবক্ষ থাকে না— তা সর্বদেশের, সর্বকালের।

শব্দার্থ ও টাকা

মামলেট	— অমলেট। ডিম ভাজা। ইংরেজি Omelette।
পনির	— লবণাক্ত জমাট বাঁধা ছানা।
কার্পেট	— গালিচা। ইংরেজি Carpet.
ভল্যুম	— বইয়ের খণ্ড। ইংরেজি Volume.
রাশান	— রুশ। ইংরেজি Russian.
তাশখন্দ	— তৎকালীন রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শহর। বর্তমানে উজবেকিস্তানের রাজধানী।
আমুদরিয়া	— তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দিয়ে থ্রাহিত একটি নদী।
খচ্চর	— ঘোড়া ও গাঁথার মতো পশু।
হিন্দুকুশ	— আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত পর্বতমালা।
চড়াই-উত্তরাই	— উচু-নিচু।
পাঞ্চলিপি	— হাতে লেখা কাগজ বা গ্রন্থ।
ভাজ	— ফুলদানি। ইংরেজি Vase.

আলাউদ্দীনের প্রদীপ – আরব্য রাজনীর কাহিনিতে উল্লেখিত আশ্চর্য প্রদীপ। এই প্রদীপের সাহায্যে এক দৈত্যের মাধ্যমে যে কোনো কিছু করতে পারা যায়।

গাঞ্জাবি – গাঞ্জাব অঞ্চলের মানুষ।

হাওয়াই জাহাজের

ঘাঁটি – বিমানবন্দর।

বিপদসংকুল – বিপদে পরিপূর্ণ।

পুরী – প্রাসাদ, আবাসস্থল বা থাকার জায়গা।

হন্দ্যতা – বক্রতৃ।

গুণী – পঞ্চিত মানুষ। এখানে বিন্দুপ অর্থে।

খাপসুরত – অত্যন্ত সুন্দর। ফারসি ‘খাপ’ ও আরবি ‘সুরত’ শব্দের মিলিত রূপ।

র্যাকেট – টেনিস খেলার ব্যাট। ইংরেজি racket.

অগটিমাম – সহজে খেলা যায় এমন অবস্থা। ইংরেজি Optimum.

ফ্রেসে বাঁধা – র্যাকেট বাঁকা না হওয়ার জন্য ক্ষু দিয়ে একটি ফ্রেমে চেপে বেঁধে রাখা। ইংরেজি press.

ছোটসে ছোটা – ছোটোর চেয়ে ছোটো।

নড় – সামনের দিকে মাথা নত করে অভিবাদন জানানো। ইংরেজি Nod.

ভোঁতা – ধারহীন। এখানে ‘চালাক নয়’ অর্থে।

ঘড়েল – পাকা, সুচতুর।

ডিপ্লোম্যাট – কূটনীতিক। রাষ্ট্রদূত। ইংরেজি Diplomat.

লিগেশন – দূতাবাসের কর্মকর্তা। ইংরেজি Legation.

প্রপেলার – ইঞ্জিনের পাখা। ইংরেজি propeller.

তারবরে – অতি উচ্চ শব্দে।

ব্যসনে – দুঃখে, কষ্টে।

রাষ্ট্রবিপ্লব – এখানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলের কথা বলা হয়েছে।

চাণক্য – গ্রাচীন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ।

ন্যাজ – লেজ।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

অষ্টম - আনন্দপাঠ

আত্মবিশ্বাস সাফল্যের চাবিকাঠি।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।